একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধার জবানবন্দি

‘দিপালী আর জোবেদারা ধর্ষিত হচ্ছে আজও’ !!!

দেওয়ান আবদুল বাসেত

আমাকে ক্ষমা করো দিপালী। তোমার ধর্ষিত হবার আমি নীরব সাক্ষী হয়েও গত ৪০ টি বছরেও তোমাকে নিয়ে কিছু লিখিনি। তোমার ইতিহাস, তোমার বঞ্চনা, তোমার ত্যাগ, তোমার দ্রোহ, তোমার আকুতি এবং না পাওয়ার বেদনা সবই আমার কলমে এতোদিন বন্দী ছিলো। জানি এতোদিন পর এই জীবন কাসুন্দি তোমার কোন উপকারেই আসবে না। তবু দেরীতে হলেও আমি তা দেশবাসীকে, আমাদের একাত্তর পরবর্তী প্রজন্মকে জানাতে পারছি বলে আমার ঋণের বোঝা, আমার অপরাধবোধ কিছুটা হলেও হালকা হবে। এর সঙ্গে দেশের জন্যে আর এক বীর-বীরাঙ্গনা এক টগবগে তরুণী এবং একজন অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা, আমার সহকর্মী শহীদ জোবেদার স্মৃতি রোমন্থন করে নিজকে একটু ভারমুক্ত করবো বলেই আজ কলম হাতে তুলে নিলাম। কথাগুলো গল্প বলার ঢং এর মতো মনে হতে পারে পাঠকদের কাছে। অথচ উহাই ছিলো আমার সেই কিশোর বয়সের মাছরাঙ্গা কিংবা ঈগল চক্ষু দু’টির প্রত্যক্ষ সাক্ষী। একাত্তরের উন্মাতাল দিনগুলোতে ঘটে যাওয়া এ মাত্র দু’টি ঘটনা। যা আমাকে এখনও প্রতিদিন প্রতিক্ষণে শিহরিত করে। প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দেয়। ব্যথিত করে। অশ্রুসিক্ত করে। আবার জাগিয়ে তুলে। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ এভাবে মরে মরে বেঁচে থাকার চেয়ে দেশ ও জাতির জন্যে কিছু একটা করে একবারেই মরতে আমাকে মন্ত্রনা দান করে।

তখন কীইবা এমন বয়স। অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে সবেমাত্র ক্লাশ করতে শুরু করেছি। বঙ্গবন্ধুর ডাকে তখন চলছে সারাদেশে (পুর্ব পাকিস্তানে) অসহযোগ আন্দোলন। মনে হয়েছে যেন তখন বঙ্গবন্ধুই দেশের সরকার প্রধান। তাঁর কথা মতোই মানে তাঁর আদেশেই চলছে দেশ। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক এবং শিল্প-কারখানা। এক কথায় সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাঁরই কথায়। চাঁদপুর জেলা শহরের পুর্ব পার্শ্বেই ক্ষীণস্রোতা নদী ডাকাতিয়ার উত্তর পাড়ে দক্ষিণ তরপুরচণ্ডী নামক ছোট্ট সবুজ গ্রামে আমার জন্ম। ছোট্ট জেলা শহরটির (তখন ছিলো মহকুমা শহর) ঠিক মাঝখানেই অবস্থিত আমাদের উচ্চ বিদ্যালয় (গনি মডেল মাল্টিলেটারেল হাই স্কুল।) পায়ে হেটেই স্কুলে যেতাম। তখনকার চাঁদপুর কলেজ যা বর্তমানে চাঁদপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এর অগ্রজ ছাত্রগন এসে আমাদের ক্লাশ থেকে টেনে বের করে নিয়ে যেত মিছিলে যোগ দেবার জন্যে। তখনকার কলেজ ছাত্রদের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাদের দু’জনের কথা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে, তাঁরা হলেন-জনাব হানিফ পাটওয়ারী এবং ফরিদগঞ্জের কালু পাটওয়ারী (দুঃখিত কালু পাটওয়ারীর প্রকৃত নামটি মনে করতে পারছিনা। তবে এনামেই তিনি তখন চাঁদপুরে বেশ পরিচিত ছিলেন।) হানিফ পাটওয়ারী (আমাদের স্কুলের উত্তর পার্শ্বেই যাদের বাড়ি) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন একটি গ্রুপের কমান্ডার হয়ে বীরত্বের সঙ্গে পুরো নয়টি মাস মুক্তিযুদ্ধে তাঁর দলকে পরিচালনা করেন। জেনেছি বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী।

তখন চাঁদপুরে চলছিলো অতিগোপনে স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুতি। তখনকার চাঁদপুর কলেজের অধ্যাপক সৈয়দ আবদুস সাত্তার এবং অধ্যাপক আবদুল মান্নান ছিলেন এর পুরো তত্ত্বাবধানে। চারজন টগবগে তরুণ ছাত্র সুশীল, শংকর, আবদুল খালেক ও আবুল কালাম ভুইঁয়া বোমা তৈরী করছিলো। মুহূর্তের জন্যে ওরা কিছুটা অসাবধান হয়ে পড়লে, ওদের তৈরী একটি বোমাই বিস্ফোরিত হয়। যাতে চার তরুণই ঘটনাস্থলে মারা যায়। সেই চারজন ছাত্রই ছিলো চাঁদপুর জেলার স্বাধীনতা প্রস্তুতি পর্বের প্রথম শহীদ।

সে কথা আমার “*মোহনার ইতিকথা*” নামক একটি নাতিদীর্ঘ কবিতায় বলেছি প্রায় দেড় দশক পুর্বে। যে কবিতাটি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের পর আমার “*ভাললাগে না*” নামক কিশোর কাব্যগ্রন্থেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ ইতিহাস তাঁদের মনে রাখার প্রয়োজনও মনে করে না। কথাগুলো বড়ই আক্ষেপের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন সাংবাদিক চুন্নু ভাই। ১৯৯৯ সালের বার্ষিক ছুটিতে থাকাকালীন চাঁদপুরের সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে কথা হচ্ছিল হাজিগঞ্জের সাংবাদিক ও ছাত্রনেতা মাহবুব আলম চুন্নু এবং অংকুর শিশু বিদ্যালয় এর প্রিন্সিপাল বন্ধুবর আলাউদ্দিন আহমেদ এর সাথে.....।

ঠিক সে সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত আমার বড় ভাই পাকিস্তানের মারী হিল্স ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছুটিতে দেশে এলেন। আর এসেই আটকে

গেলেন। বলা যায় বিবেকের কাছে আটকে গেলেন। যদিও একবার তিনি প্রস্তুতি নিয়েছিলেন পাকিস্তান ফিরে যাবার জন্যে। ঠিক এমনি সময়ে লাহোরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত আমার এক মামার একটি ম্যাসেজ বহন করে আনে তখনকার ডাকবিভাগের পোষ্টকার্ড। '*না ফিরে নিজ দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকো*'। আর তাতেই তিনি পাকিস্তানে ফেরা থেকে বিরত থাকলেন। নিজ দায়িত্ববোধ থেকেই তিনি চাঁদপুরের লন্ডন ঘাটের পেছনে বালুর মাঠে একটি গাদা রাইফেল দিয়ে (যা চাঁদপুর থানা থেকে তিনি পেয়েছিলেন) বেশকিছু ছাত্র ও বিভিন্ন পেশাজীবিদের ট্রেনিং দিতে শুরু করলেন। সেখানে আমিও কিছুদিন ট্রেনিং নিলাম। তখন জানতাম যে এ ট্রেনিং দিয়ে এবং ঐ জাতিয় একটি গাদা রাইফেল হলেই যুদ্ধ করা যাবে। দেশকে স্বাধীন করা যাবে। পরে বোঝেছি তাতে যৎসামান্য আত্মরক্ষা করা ছাড়া যুদ্ধ করা যায় না।

একদিকে মিছিল। অন্যদিকে ট্রেনিং। এমনি মিছিলে-ট্রেনিংএ মুখরিত চাঁদপুর তথা পুরো দেশটা হঠাৎ করেই মৌন-মূক হয়ে গেল। ২৫শে মার্চের কালো রাতে বর্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঝাপিয়ে পড়লো নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর। গনহত্যার মহোৎসবে তারা মেতে উঠলো। শহর ছেড়ে লাখো লাখো মানুষের স্রোত তখন গ্রামের দিকে। নৌ-সড়ক-আকাশ পথ সবই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। যানবাহন বলতে কিছুই ছিলো না। সেই কিশোর বয়সে মানুষের দুর্ভোগ দেখে কতবার যে কেঁদেছিলাম তা একমাত্র আল্লাহ্‌ই ভালো জানে।

সেই মহিলাটির অবস্থা দেখেই মনে হয়েছে আমাদের পুরো দেশটিও তখন পোয়াতি। সন্তান প্রসব যন্ত্রণায় তখন ছটপট করছে। সে সন্তান দেবে যার নাম হবে বাঙালি জাতি.....।। অবশেষে সে দিয়েছেও তা।

একদিন বিকেল তিনটা হবে হয়তো। বাড়ির পাশ দিয়ে হাজার হাজার শহুরে লোকজন পায়ে হেটে যাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। আমাদের বাড়ির দক্ষিন পাশে একটি তালগাছের কাছে এসে এক গর্ভবতী মহিলা হঠাৎ করে ঘুরে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর শোনা গেল চীৎকার। আমি দৌঁড়ে গেলাম। দেখলাম একজন লোক সম্ভবত: মহিলার স্বামী। কিংকর্তব্যবিমূঢ় তিনি কি করবেন। কোথায় যাবেন। কান্না জড়িত কণ্ঠে দিশেহারা। মাত্র দশ-বারো হাত দুর দিয়ে হাজার হাজার নারি-পুরুষ- শিশুরা হেটে যাচ্ছে। অথচ কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। সেই কঠিন সময়টাতে কারো প্রতি কারো ফিরে তাকাবার সময়ও ছিলো না। সে সময়ে সবাই নিজকে নিয়ে ব্যস্ত। চাচা আপন বাঁচার সময়। সবাই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে নিজের জানটি নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে।

আমি ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরে দৌঁড়ে এসে আমার বোনকে বললাম। সে আরও কয়েকজন মহিলা নিয়ে ছুটে গেলো সেই পড়ে যাওয়া গর্ভবতী মহিলার কাছে। সেখানে আমার আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই দুর থেকে দেখলাম আমাদের বাড়ির মহিলারা তিন চারজন তাদের শাড়ির আঁচল খুলে সেই মহিলাকে ঘিরে ধরেছে। বাকি দু'জন সেই মহিলার পাশ ঘেষে বসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই মহিলার একটি ফুটফুটে বাচ্চা হয়েছে। তারপর আমি আমাদের আশে পাশের আরও কয়েকজন মহিলা জড়ো করে পাঠালাম সেখানে। তারা সম্পূর্ণ ব্যবস্থা নিলো।

সেই মহিলাকে আমাদের এখানে দু'দিন রাখলাম। তার স্বামী বেচারা চাকুরীজীবি। শহর ছেড়ে পায়ে হেটে যাচ্ছিলো পোয়াতি স্ত্রী নিয়ে নোয়াখালী। পথিমধ্যে এ ঘটনা। এমনি হাজারো ঘটনা ঘটেছে বাংলার সর্বত্রই তখন। আমি পরে একটি নৌকা দিয়ে যতদুর পারা গেলো তাদের এগিয়ে দিয়ে আসলাম। অবশ্য যেখানে তাদের পৌঁছালাম, সেখান থেকে যান-বাহন হিসেবে অন্তত: রিক্সা পাওয়া গিয়েছিলো। তাদের যাবার একটি ব্যবস্থা করতে পেরে নিজের মনে পরম শান্তি পেয়েছিলাম। ***সেই মহিলাটির অবস্থা দেখেই মনে হয়েছে আমাদের পুরো দেশটিও তখন পোয়াতি। সন্তান প্রসব যন্ত্রণায় তখন ছটপট করছে। সে সন্তান দেবে যার নাম হবে বাঙালি জাতি.....।। অবশেষে সে দিয়েছেও তা।***

বাংলাদেশের মানুষের দুর্ভোগ তখন চরমে। তখন আমাদের শ্রষ্টা নীরবে হাসছিলেন বলেই আমার মনে হয়েছে। সেই দুর্ভাগা জাতির দুর্ভোগ আজও শেষ হয়নি। এখনও পদে পদে দুর্ভোগ!! নিয়তি যেন এ জাতির ললাটে দুর্ভোগের স্থায়ী সীলমোহর লাগিয়ে দিয়েছে!।

দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। খবরাখবর জানার জন্যে তখন সবারই সম্বল ছিলো রেডিও। যার মাধ্যমে জানা যাবে দেশে কী হচ্ছে! সে সময়ে রেডিওতে মাধ্যম হয়েছিলো শুধু আকাশ বাণী কোলকাতা এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও। ঢাকা রেডিও কেন্দ্র যেহেতু পাকবাহিনীর দখলে তাদেরকে তো কোনভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। আমার বড় ভাই পাকিস্তান হতে আসার সময় তখনকার দিনে পঁচিশ রুপিয়া দিয়ে খরিদ করে এনেছিলেন একটি ফিলিপ্স রেডিও। পুরো এলাকায়ই ঐ একটি রেডিও ছিলো সবে ধন নীল মনি। যার জন্য এলাকার প্রায় সবাই এসে জড়ো হতেন আমাদের রেডিওটার পাশে খবরা-খবর জানার জন্যে ।

২৬ মার্চ'৭১ সকালে হঠাৎ চট্টগ্রামের কালুর ঘাট রেডিও স্টেশন (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) থেকে জনৈক এম, এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর পাঠানো স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র পাঠ করলেন। স্বাধীনতা শব্দটি শোনেই হৃদয়টি যেন নেচে উঠলো। একই পত্র আবার বেলা ২টায় পড়লেন। চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম রেডিও স্টেশনের সমস্ত প্রোগ্রামই পরিস্কার শোনা যেত। পরে জেনেছি তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ডাকসাইটের নেতা। আরও একটা ঘোষণার কথা শোনেছি আমার প্রয়াত দাদা দেওয়ান হাকিম উদ্দীন এর কাছে। তিনি বলেছিলেন সেই ঘোষণাটি যে পাঠ করেছেন, তিনি নাকি তার নাম উল্লেখ করেছিলেন আবুল কাশেম সন্দ্বীপ। দাদাকে সঙ্গে সঙ্গেই বললাম-আপনার মনে নেই দাদা এ ঘোষণা যে আমরা ৭ই মার্চে ঢাকা রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর ভাষণেই শোনেছি..... এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম.... এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম... যা তখনকার রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র থেকে ৮ই মার্চ'৭১ এ প্রচারিত হয়।

তারপর আবার একই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন ২৭ মার্চ'৭১ বিকেলে একজন অপরিচিত মেজর জিয়াউর রহমান। পরবর্তীতে সৌভাগ্যক্রমেই যিনি দেশটির রাষ্ট্রপ্রধানও হয়েছিলেন। তিনি উলেখ করলেন (আমার যতটুকু মনে আছে) বিপবী বাংলা বেতার কেন্দ্র নাকি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) থেকে আমি মেজর জিয়া বলছি....আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আমি ঘোষণা করছি আজ হতে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র .....দেশবাসী আপনারা সবাই স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ুন....।। ইংরেজী ভাষণেও তিনি যেমন উল্লেখ করেছিলেন...'অন বিহাফ অব আওয়ার গ্রেট লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'....।।

অথচ এখনকার আমাদের দেশের কিছু ভাড়াটে ইতিহাসবেত্তা, 'ওয়েদার কক্' এবং ক্ষমতাবানেরা এই দিবালোকের মতো সত্য-সহজ বিষয়টিকে নিয়ে এমন ধুম্রজালের সৃষ্টি করেছেন। পরিস্কার বিষয়টির উপর এমন কুয়াশার চাদর বিছিয়ে দিয়েছেন। ইতিহাসকে বানিয়েছেন নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো কল্পলোকের গল্প। অথচ ইতিহাসতো নিজ গতিতেই চলে। না ওনারা দিচ্ছেন না ইতিহাসকে তার নিজ গতিতে চলতে। যার ফলে আমাদের নতুন প্রজন্ম স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস থেকে বহুদূরে নিক্ষেপিত হচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে তাদের শেখানো হচ্ছে একটি বিকৃত ও খন্ডিত ইতিহাস।

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান যিনি '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে একটি সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর অসামান্য অবদান জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় কখনো তাঁর মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে একবারও কটূক্তি করেননি। নিজে কখনো বলেননি যে, তিনি নিজেই একমাত্র স্বাধীনতার ঘোষক। যার জন্যে ওনার প্রতি শুরু থেকেই আমার মাঝে আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ কাজ করে আসছে। অথচ তাঁর উত্তরসূরী ও বশংবদরা আজ অবলীলায় একটি ঢাহা মিথ্যেকে এমনভাবে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই নয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্রের এমন বিকৃতি ঘটিয়েছে, সে জন্যে পুরো জাতি আজ হতবাক এবং ক্ষুব্ধ। তাতে 'লেটেস্ট জেনারেশান'কে, দেশকে এমনকি জাতিকে দিনকে দিন অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছে। রীতিমতো বিতর্কিত করে তুলছে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানকে তারই উত্তরসুরি আর বশংবদরা। আর এদিকে আমাদের যে সকল সন্তানেরা বিদেশে বেড়ে উঠছে। তারা দেখে না মুক্তিযুদ্ধ, জানে না মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। বাঙালি জাতির হাজার বছরেরও শ্রেষ্ট অর্জন মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা। সে সরল সত্যটিকে প্রবাসেও প্রভুভক্ত সারমেয়রা বাচ্চাদের শেখাচেছ যত্তসব উদ্ভট এবং বিকৃত ইতিহাস। আমাদের আজকের প্রজন্মকে কৌশলে বিকৃতির অন্ধকারে ডুবিয়ে দেয়া হচ্ছে, সঠিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সূর্যদীপ্ত আলো হতে। প্রতিবাদ কে করবে?! এখানকার মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিগুলো বহু খন্ডে খন্ডিত!!

আমিতো একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম, ছিলাম অনুজ লেখক। কিন্তু ছিলো কিশোর বয়সের শাণিত ঈগল চক্ষু এবং শাণিত স্মরণশক্তি। তবুও নিজকে সমৃদ্ধ করার জন্য, বিষয়টি তথ্যবহুল করার জন্য এখন অগ্রজদের, বড়দের লেখা থেকে জানার চেষ্টা করবো। অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রার নির্বাহী সম্পাদক, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিষ্ট, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির নির্বাহী সভাপতি জনাব শাহরিয়ার কবির। ***"মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস ধর্ষণকারীদের ক্ষমা নেই"*** শিরোনামে দৈনিক জনকণ্ঠের চতুরঙ্গ বিভাগে (১১জুলাই'০৪) এ প্রকাশিত তাঁর একটি বিশেষ নিবন্ধে তিনি বলেন - ....হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় ১৯৮২ সালের নভেম্বরে ১৫ খন্ডে স্বাধীনতা যুদ্ধের যে দলিলপত্র প্রকাশিত হয়েছিল তা সম্পূর্ণ না হলেও এর কোন তথ্য সম্পর্কে এতকাল কেউ কোন প্রশ্ন তোলেনি। কারণ এই পনেরো খন্ড কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা লিখিত ইতিহাস নয়, এগুলো ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংক্রান্ত দলিলপত্রের সঙ্কলন। জিয়া নিজের জীবদ্দশায় তাঁর স্বাধীনতা সংক্রান্ত বেতার ভাষনের তারিখ ২৭ মার্চ বলে উলেখ করেছেন, ২৬ মার্চ নয়। বঙ্গবন্ধুকে ***জাতির জনক*** আখ্যায়িত করে জেনারেল জিয়া বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকেই স্বাধীনতার 'গ্রীন সিগন্যাল' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। জেনারেল জিয়া যদি জানতেন

তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী তাঁকেই মিথ্যাবাদী বানিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে জোটীয়করণ করবেন, তাহলে তিনি নিজেই তাঁর ২৭ মার্চের ভাষণকে ২৫ মার্চ হিসাবে চালাতেন। জেনারেল জিয়া ২৫ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এমন অসম্ভব মিথ্যাচারের কোন রেকর্ড '৭১ এর মার্চ থেকে জিয়ার মৃত্যু পর্যন্ত কোথাও কেউ নথিবদ্ধ করেনি।

২৭ মার্চ জিয়া তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে নিজেকে বাংলাদেশের অস্থায়ী বিপবী সরকারের প্রধান হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন বটে, তবে পরের ভাষণেই এই ভুল শুধরে নিয়ে 'মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে' স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলেছেন - যা পৃথিবীর বহুদেশে বেতার কেন্দ্রের আর্কাইভে নথিবদ্ধ রয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি পর্ব সম্পর্কে আমি গত দশ বছর ধরে তথ্য সংগ্রহ করছি। এই তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ২৬ মার্চ বঙ্গাবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা কীভাবে বর্হিবিশ্বে প্রচারিত হয়েছে সে দলিলের অনুলিপি আমার সংগ্রহে রয়েছে।

২৭ মার্চ ভারতের সকল শীর্ষস্থানীয় দৈনিকের প্রথম পাতার খবর ছিল - 'শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন'। খালেদা-নিজামীর পোষ্য ইতিহাস রচয়িতা এমাজউদ্দীন-মনিরুজ্জামান মিঞা গং যখন বলেন বঙ্গাবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কোন প্রামাণ্য তথ্য তাঁরা খুঁজে পাননি তখন সন্দেহ জাগে তাঁদের মনুষ্য অবয়ব সম্পর্কে। তাঁরা প্রমাণ করেই ছেড়েছেন দুই পায়ে হাঁটলে যেমন মানুষ হওয়া যায় না, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলেই শিক্ষিত হওয়া যায় না। খালেদা-নিজামীদের তুষ্ট করার জন্য স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস ধর্ষণ করে এমাজ-মিঞারা নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন প্রভুভক্ত সারমেয়কুলের পঙক্তিতে......।

এ প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল (অব:) সুবিদ আলী ভুইঁয়া পিএসসি কর্তৃক লিখিত '*প্রসঙ্গঃ স্বাধীনতার ঘোষণা*' শিরোনামের নিবন্ধটি প্রণিধানযোগ্য। যা প্রকাশিত হয়েছে জাতীয় দৈনিক যুগান্তর এ (শুক্রবার ২৬মার্চ'০৪ইং স্বাধীনতা দিবস বিশেষ সংখ্যায়)। তিনি তাঁর নিবন্ধে বলেছেন- ''আর মেজর জিয়া জীবদ্দশায় নিজেকে কখনও 'স্বাধীনতার ঘোষক' বলে দাবী করেন নি। এমন কি স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালের ২৬ মার্চ *সাপ্তাহিক বিচিত্রায় 'একটি জাতির জন্ম'* শীর্ষক যে নিবন্ধটি মেজর জিয়া নিজে লিখেছিলেন, তাতেও নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে উলেখ করেননি। এমনকি '৭৪ সালের *বিচিত্রায়* প্রকাশিত সে নিবন্ধে জিয়াউর রহমান বঙ্গাবন্ধুকে *'জাতির পিতা'* হিসেবে সম্বোধন করেছিলেন। আজ কেন বিশেষ মহল মেজর জিয়াউর রহমানকে *'স্বাধীনতার ঘোষক'* বানাতে উঠে পড়ে লেগেছে- সেটাই চিন্তার বিষয়।''

জেনারেল ভুইঁয়া ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ'৭১ এ রমনা রের্সকোর্সে বঙ্গাবন্ধুর দেয়া ভাষণের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন তার নিবন্ধে। তাহলো- 'বঙ্গা বন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিলো ১৮ মিনিটের। তাতে ছিলো ১০০৭টি (একহাজার সাত) শব্দ। আর সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি ছিলো অলিখিত........।'

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের আরও কয়েকজন খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও কলামিষ্টদের বিভিন্ন পত্রিকায় এবং গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি - *"ইতিহাসের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়া"* শিরোনামে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত (১১ জুলাই'০৪) প্রখ্যাত লেখক-কলামিষ্ট বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর তাঁর নিবন্ধে বলেন- বিএনপি কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র সংশোধন করে পঞ্চদশ খন্ড প্রকাশ করেছে। এই সংশোধিত দলিলে বলা হয়েছে : জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম রাষ্ট্রপতি, প্রথম এবং একমাত্র ঘোষক।

সত্য হচ্ছে জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের তৃতীয় ঘোষক এবং জিয়াউর রহমান বঙ্গাবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। বিএনপি কর্তৃপক্ষের ইতিহাস সংশোধন যদি সত্য হয়, তাহলে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণা কেন কোন দেশ স্বীকার করেনি, কেন মুক্তিযুদ্ধের সময়ে জিয়াউর রহমান একজন সেক্টর কমান্ডার হিসাবে জীবন যাপন করেছেন? এসব করে কি খালেদা জিয়া এবং তাঁর পরিবার এবং তাঁর দলের ভাবমুর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে? ইতিহাস তো ফালুদের মতো অনুগৃহীত ব্যক্তি নয়। খালেদা জিয়া নিজেকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। সেখান থেকে সরে আসার কোন পথ নেই। তিনি সর্বশক্তিমান নন......।

দৈনিক আজকের কাগজ (১৮ জুলাই'০৪) এর সংখ্যায় প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলাম লেখক বেবী মওদুদ *"মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি"* ...শিরোনামের নিবন্ধে লিখেছেন - ২৫ মার্চ রাতে জেনারেল ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করে এবং নির্দেশ দিয়ে যায় নিরস্ত্র বাঙালি হত্যার। আর শেখ মুজিব বাংলাদেশের ঘোষণা দেন তাঁর ঐতিহাসিক ৩২নং সড়কের বাড়ি থেকে। সে ঘোষণা টেলিগ্রাম, টেলিফোনের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে সর্বত্র দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে পোঁছানো হয়। ২৬ মার্চ তা সকলের হাতে পোঁছায়।

২৭ মার্চ কালুর ঘাটে স্বাধীন বাংলার যে বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হয় সেখানে প্রথম সেটা পাঠ করেন এম এ

হান্নান ও অন্যান্যরা। তারপর এক খেয়াল হলো, তারা একজন আর্মির লোক দিয়ে তা পাঠ করার জন্য মেজর রফিকের (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বহু মূল্যবান গ্রন্থ *"লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে"* র গ্রন্থকার) কাছে খবর দিলে তিনি বলেন, 'আমি ব্যস্ত আছি, জিয়াকে বলেন ও পড়ে দিয়ে আসবে।' এভাবে জিয়াকে নিয়ে এসে বসিয়ে কয়েকবার পড়ানো হয় এবং সেখানে তিনি স্পষ্ট উচ্চারণ করেন যে, আমি মেজর জিয়া বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেদিন যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, এ তো চিরন্তন সত্য। আর তার পক্ষে জেনারেল জিয়া যে সেই ঘোষণা পাঠ করেছিলেন সেটা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মোহাম্মদ বেলাল ও আবুল কাসেম সন্দীপও তাদের লেখায় উলেখ করেছিলেন। তখন মেজর জিয়া না পড়ে অন্য কোনও ক্যাপ্টেন ও মেজর পড়লেও পারতেন - এ নিয়ে এখন এই বিতর্ক তুলে বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের জাতি হিসেবে এমন হেয় করার উদ্দেশ্য কী?

"জোট সরকারের শাসন " শিরোনামের কলামে কথাসাহিত্যিক ও কলাম লেখক হরিপদ দত্ত বলেন - শেষ রক্ষার জন্য জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে একের পর এক চলছে অবিশ্বাস্য সব কান্ডকারখানা। স্বাধীনতাকে পদদলিত, লাঞ্ছিত, রক্তাক্ত করছে যারা তারাই কিনা এর 'ঘোষক' নিয়ে রাতদিন উন্মাদের কান্ড করে যাচ্ছে। সংবিধান আর পবিত্র নেই। ইতিহাসও হয়ে গেছে লুটের মাল। জিয়া যে স্বাধীনতার ঘোষক এটা প্রমাণের জন্য উন্মাদের যে আচরণ চলছে, জনগণ হাসবে না কাঁদবে, ভেবে পাচ্ছে না। সন্ত্রাসী লুটেরা আর সাম্রাজ্যবাদের হাতে দেশের সার্বভৌমত্ব তুলে দিয়ে কিনা স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে এতো হাস্যকর চেষ্টা। এ যেন কুষ্ঠরোগীর আঙ্গুলের নখ হারানোর জন্য দুশ্চিন্তা......।

''স্বাধীনতার শত্রুরা যখন দেশের রং বদলায়" উক্ত শিরোনামে সুসাহিত্যিক কে.জি. মুস্তাফা (১৯ জুলাই'০৪ দৈনিক জনকণ্ঠ) এর সম্পাদকীয় কলামে একটি চমৎকার লেখা লেখেন। তাঁর লেখার একটি অংশে তিনি উলেখ করেন-১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের, তথা বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার জন্য ড. মাযহারুল ইসলামকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করেন। ওই কমিটির কাজ ছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়ন করা। বঙ্গবন্ধু টেলিফোনে জানালেন আমাকে ওই কমিটির সদস্য করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি আপত্তি জানালাম এই কারণে যে, দেশে অনেক গুণী ইতিহাসবিদ আছেন, তাঁদের নিয়ে এই কমিটি গঠন করা যেতে পারে। ড. এ-আর মলিক, ড. সালাউদ্দিন প্রমুখ কয়েকজনের নামও উলেখ করলাম কমিটির সদস্যরূপে নিয়োগ করার জন্য। আমি কমিটিতে থাকব না এ কথা পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিলাম বঙ্গবন্ধুকে। আরও একটি কথা আমি উলেখ করেছিলাম। আমার মতে, ড. মাযহারুল ইসলাম বাংলার অধ্যাপক হয়ে ইতিহাস রচনার কমিটিতে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলে অনেকেই আপত্তি জানাবেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ওই প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে সম্মত হন। বর্তমান সরকার একতরফাভাবে ইতিহাস রচনার প্রকল্প ও ১৫ খন্ড দলিলের কাটাছেঁড়া ইত্যাদি নিয়ে যে কান্ড-কারখানা শুরু করেছে তাতে দেশের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক চিত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। তার পরিবর্তে পাওয়া যাবে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মহলের চক্রান্তের চিত্রাবলী। এসব চক্রান্তের জাল ছিন্ন করেই মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস খুঁজে বের করতে হবে। আমরা যদি নাও পারি, আমাদের সন্তানরা অবশ্যই সে কাজ সম্পন্ন করবে......।

"প্রসঙ্গ ঃ ইতিহাস বিকৃতি" (*সাপ্তাহিক২০০০* জুলাই'০৪) সংখ্যায় উক্ত শিরোনামে বেশ ক'জন দেশ বরেণ্য ব্যক্তিত্বের কিছু মতামত সংকলিত করেছেন জনাব **সাইফুল হাসান**।

আমাদের দেশের প্রধান কবি ***শামসুর রাহমান*** বলেন - এখন যারা ক্ষমতায় তাদের আমি বিশ্বাস করি না। বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে যা চলছে, এটা তো অন্যায়। আমাদের দেশে যা এখন চলছে তার অনেকটাই ধোঁয়াটে। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিতর্কের কিছু নেই। একদম গোড়া থেকে দেখলেই স্বাধীনতার ঘোষক কে সেটা বোঝা যায়........।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীঃ স্বাধীনতার ঘোষক কে এটা নিয়ে বিতর্ক করা অপ্রয়োজনীয়। সময়ের অপচয়। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে এখন যে বিতর্ক চলছে সেটা রাজনৈতিকভাবে করা হচ্ছে। ঐতিহাসিক কোন কিছু নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে না। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি বিষয়টি যে যার দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। পুরো জাতিকে অহেতুক বিতর্কের মাঝে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। যদিও আমার মনে হয় জাতি এই বিতর্কের সঙ্গে নেই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস বদলের ঘটনা আমাদের এখানে ঘটছে। কিন্তু মূল ব্যাপার হলো, ২৫ মার্চের ঘটনার পর থেকে পুরো জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাকিস্তানিদের প্রতিরোধ করেছে। আমরা স্বাধীন জাতি ঐতিহাসিকভাবে এটাই স্বীকৃত সত্য এখন, স্বাধীনতা শুধু একটি ঘোষণার ব্যাপার নয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সেই '৫২ সাল থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলছে। যার ধারাবাহিকতায় আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি........ ।

১৬ জুলাই'০৪ *দৈনিক আজকের কাগজ* এর খোলা হাওয়া বিভাগে ***"মুক্তিযুদ্ধ নয়, রাজাকারদের মন্ত্রনালয়"*** শিরোনামে বিশিষ্ট কলামিষ্ট, লেখক, রাজনীতিবিদ ও প্রাক্তন তথ্য-প্রতিমন্ত্রী ***অধ্যাপক আবু সাইয়িদ*** বলেন - ১৯৭৫ সালের ২৬মার্চ ***'বাংলাদেশ সংবাদ'*** ম্যাগাজিনে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ***"স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা"*** শিরোনামে ম্যাগাজিনের শেষ প্রচ্ছদে নিম্নোক্ত বাণীটি প্রচারিত (প্রকাশিত) হয়। .....'পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিলখানা, ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমন করেছে এবং শহরের লোকদের হত্যা করছে। ঢাকা, চট্টগামের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতি সমুহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তি যোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ, দেশকে স্বাধীন করার জন্যে শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্যে পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গাল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান।

কোনও আপোস নেই, জয় আমাদের হবেই। আপনাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুণ। সকল আওয়ামীলীগ নেতা, কর্মী এবং অন্যান্য সকল দেশ প্রেমিক ও স্বাধীনতা প্রিয় লোকদের এই সংবাদ পোঁছে দিন। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গাল করুন........... ***জয় বাংলা।***

উক্ত ***বাংলাদেশ সংবাদ*** ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বাংলা বাণীটির নিচে লেখা রয়েছে - 'চট্টগ্রাম ইপিআর অয়্যারলেস ঘাঁটি এবং জহুর আহমদ চৌধুরীকে প্রেরিত বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বাণী' যারা এই বাণী গ্রহণে ও প্রেরণে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন: কে, এস, এম, এ হাকিম, মোহম্মদ জালাল আহম্মদ, আবুল কাসেম খান, জুলহাস উদ্দিন, আবুল ফজল ও শফিকুল ইসলাম।

স্মরণযোগ্য যে এ বাণীটিই কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথমে ২৬ মার্চ দুপুর ২টায় সেখানকার আওয়ামীলীগ নেতা এম এ হান্নান ও পরের দিন ২৭ মার্চ '৭১ কিছুটা পরিমার্জনাসহ তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান পাঠ করে শোনান.......।

এবার আমরা একজন মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারের কথা শুনবো.......১৯৭১এর ২৫মার্চে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের প্রথম সেনাবিদ্রোহের মহানায়ক মেজর রফিক। যাঁর পরবর্তীতে পরিচয় মুক্তিযুদ্ধের ১নং সেক্টর কমান্ডার ***মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম*** । ২৫মার্চ রাত ৮ঃ৪০মিনিটে তিনি তাঁর অধীনস্থ ইপিআর এর বাঙালি সৈনিক ও জেসিও-দের নিয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেন এবং রাত ১১ঃ৩০মিনিটের মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্ধ, ছাত্র-জনতার সম্মিলিত সহায়তায় সমস্ত চট্টগ্রাম শহর দখলে আনতে সক্ষম হন........।

এই অসমসাহসী মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক লিখিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল ***"লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে"*** গ্রন্থের ইনারলীপে উপরোলিখিত বর্ণনাটি দেয়া আছে। ১৯৮১ সালে জাতীয় সংসদে বইটি মুক্তিযুদ্ধের বিশ্বস্ত দলিল হিসেবে বহুল আলোচিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস বিকৃত, অস্পষ্ট ও ঝাপসা হয়ে যাওয়ার পূর্বেই মুক্তিযুদ্ধের এক অগ্রণী সৈনিকের সচেতন প্রয়াসে রচিত এই গ্রন্থ মহান মুক্তিসংগ্রামের এক বিশ্বস্ত দলিল।

জনাব মেজর ইসলাম তাঁর গ্রন্থের ভূমিকার ৭ম প্যারায় লিখেছেন - 'আমরা ২৫ মার্চ রাত ৮ঃ৪০মিনিটে চট্টগ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার তিন ঘন্টা পরেও অবশ্য কিছু বাঙালি সামরিক অফিসার পাকিস্তানিদের ঘনিষ্ট সহযোগী হিসেবে কাজ করে চলেছিলেন একযোগে- এবং চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গারকৃত সমুদ্রগামী মালবাহী জাহাজ এম, ভি সোয়াত থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নামিয়ে আনার কাজ বিশ্বস্থতার সাথে পালন করে যাচ্ছিলেন। পাকিস্তানিরা পরে এই সব অস্ত্র ও গোলাবারুদই ব্যবহার করেছিল লক্ষ লক্ষ বাঙালি হত্যায়। তবে উলেখিত বাঙালি সামরিক অফিসারগন নিতান্তই সৌভাগ্যবান যে, কঠিন সংকটের ঠিক ক্রান্তিলগ্নে পাকিস্তানিরা তাঁদের হত্যা করতে পারে এ কথা চিন্তা করে তাঁরা আমাদের সাথে যোগ দেন। স্বতঃস্ফূর্ততা নয়, সার্বিক অবস্থা এবং স্বীয় নিরপত্তার বিবেচনাই তাঁদেরকে শেষ মুহূর্তে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করে।'

১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি থানার নাওড়া গ্রামে জন্মগ্রহণকারী এই বীরউত্তম মুক্তিযোদ্ধা তাঁর ৪১৬ পৃষ্ঠায় লেখা ***"লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে"*** গ্রন্থের ১৩০-১৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন........ওদিকে ক্যান্টুনমেন্টে (চট্টগ্রাম) আক্রমন করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম বিধায় আমি শহরের বাইরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যেতে পারছিলাম না। আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ তখন প্রতিমুহূর্তে আমার সঙ্গো যোগাযোগ রক্ষা করছেন। তখন আমি তাঁদের অনুরোধ করি তাঁরা যেন কালুরঘাট ব্রিজ এলাকা থেকে যে কোন একজন সিনিয়র বাঙালি আর্মি অফিসারকে দিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে একটা বিবৃতি পাঠ করান যে, সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার, জেসিও ও সৈন্যরা জনগণের সাথে মিলে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

সেদিন অপরাহ্নেই তাঁরা কালুরঘাট ব্রিজের পূর্বপ্রান্তে গিয়ে দেখেন মেজর জিয়া তখনও সেখানে আছেন। আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দের অনুরোধে ২৭ মার্চ বিকেল বেলা মেজর জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আসেন এবং সেদিন সন্ধ্যায় তিনি সেখান থেকে একটি ভাষণ দেন। রেডিওতে তাঁর প্রথম ভাষণে তিনি নিজেকে 'রাষ্ট্রপ্রধান' বলে উলেখ করলেন। কিন্তু ঘোষণায় এ ধরণের বক্তব্য আসার কথা নয়। কথা ছিল যে, তিনি রেডিওতে ভাষণে বলবেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং বাঙালি মিলিটারী, ইপিআর ও পুলিশ জনগণের সাথে মিলে পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

নিজেকে 'রাষ্ট্রপ্রধান' হিসেবে উলেখ করে ভাষণ দেয়াটা সম্ভবত: সে সময়ের উত্তেজনাকর মানসিক অবস্থায় অসাবধানতার কারণেই হয়েছিল। এবং এটা একটা অনিচ্ছাকৃত ভুল। স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার অধিকার সামরিক অফিসারদের নেই। সে অধিকার শুধুমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের.....। নিজেকে 'রাষ্ট্রপ্রধান' ঘোষণা করা যে একটা গুরুতর ব্যাপার এবং ভুল মেজর জিয়া তা বুঝতে পারলেন এবং নতুন করে তৈরী একটি বিবৃতি রেডিওতে পাঠ করে শোনান। এবার তাঁর ভাষণে তিনি দ্ব্যর্থহীন এবং পরিস্কারভাবে উলেখ করলেন যে, তিনি বক্তব্য রাখছেন বাঙালি জাতির নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে.........।।

আমার নিজের সরাসরি শোনা এবং দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের বক্তব্যগুলো পড়ার পর এটা দিবালোকের মত সত্য যা তা হলো- তিনি (মেজর জিয়া) ছিলেন স্বাধীনতা ঘোষণা পত্রের দ্বিতীয় পাঠক। যদি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেই স্বাধীনতার ঘোষক হওয়া যায়, তাহলেতো বলতেই হয় সে ঘোষণা পত্রটিতো প্রথম পাঠ করেছিলেন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের নেতা জনাব এম, এ হান্নান। তাহলে তো তিনিই স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক। আর দ্বিতীয় ঘোষক মেজর জিয়া নয় কি (?!)

যদিও বঙ্গবন্ধুর পাঠানো স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রের দ্বিতীয় পাঠক হিসেবে উচ্চারণ করতে আমরা বার বারই জনাব আবুল কাসেম সন্দ্বীপ এর নাম বেমালুম ভুলে থাকি.......!

সেই কিশোর বয়সেই শরীরে স্বাধীনতার জন্যে আবেগের জোয়ার এর কোন অন্ত ছিলো না। তখনও আমার জানা ছিলো না, স্বাধীনতার জন্যে এতো ত্যাগ এবং এতো রক্ত ঝরাতে হয়। এতো নির্যাতন ভোগ করতে হয়। মা-বোনের এমন পাইকারীভাবে ইজ্জত হারাতে হয়।! জানা ছিলো না আমাদের দেশের কিছু লোকেরা নিজ দেশটার সঙ্গে গাদ্দারী করবে। নিজেদের মা-বোনের ইজ্জতের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করবে। ওরা স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি। পাকিস্তানের দালাল, চাটুকার। যাদের চরিত্রের আজও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। যদিও তাদের সীমাহীন সৌভাগ্যের ফলেই পেয়েছিলো সাধারণ ক্ষমা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে। সে ক্ষমার মর্যাদা তারা কি রক্ষা করেছে ?

বার বার বঞ্চনার শিকার হয়ে নিজ দেশেই যখন মানুষ পরবাসী হয়ে যায়। পেছনে যেতে যেতে যখন মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়। শুধু তখনই আত্মরক্ষার জন্যে সে প্রথমে প্রতিরোধ করবে। যদি তাতেও জীবন বিপন্ন হতে থাকে। তখন প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হবে। আমাদের জন্যেও সেই সময়টি এসেছিলো একাত্তরের দিনগুলোতে। আমাদের ঘাড়ে একটি অসম যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো। অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত একটি নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে আমরা যুদ্ধে নামলাম গাঁইতি-শাবল-টেটা-যুঁতি-দোনালা বন্দুক আর দু'চারটা গাদা রাইফেল নিয়ে।

না। চাঁদপুরের বাড়িতে আর থাকা সম্ভব হলো না। কেন না ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের নাপাকবাহিনী চাঁদপুরে এসে টেকনিক্যাল হাই স্কুলে তাদের স্থায়ী আস্তানা গেড়েছে। বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে। কোন কারণ নেই, কিন্তু নেই। যেখানে সেখানে তারা নিরীহ মানুষদের গুলী করে হত্যা করছে। মনে হচ্ছে যেন তারা পাখি শিকারে এসেছে। কিংবা বন্দুক দিয়ে হাতের নিশানা ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করছে। স্থানীয় আমাদের কিছু স্বজাতি ভাইয়েরা তখন পাকিস্তানী সেনাদের সহযোগীতা করতে শুরু করেছে। তাতে এলাকায় থাকা আরো বেশী বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

আমরা নিজ বাড়ি ছেড়ে (যা জেলা শহরের খুব কাছে) পরিবারের সবাই গ্রামের গহীনে দুরের এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। কিছুকাল যেতে না যেতেই সেখানেও ভয় নিয়মিত হানা দিতে থাকলো। পরে একদিন মা ডেকে বললেন- 'বাজান, তুই যদি এইভাবে গেরামে পইড়া থাহস, তাইলে তোরেও হারাইতে অইবো চোহের সামনে। বড় পোলাডা ছুডিতে আইয়া কোন্ডাই আরিয়ে গেল। আলাহ্ মাবুদ জানে। তুই একটা কাম কর বাপ কারা কারা যেন ইন্ডিয়া যায় টেরেনিং লইতে। তুইও হেয়ানে চইলা যা। তারপর মুক্তি বইন্যা আইসা দেশের লেইগ্যা যুদ্ধ কর। মরতে যদি অয় বাবা তাইলে যুদ্ধ কইরাই মরিস। হেইডাতে দাম আছে। আমি আলাহ্-খোদার নাম জইপ্যা বুহে পাষান বাইন্দাই থাহি।

অগত্যা শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে আগ্রহী যারা সেই সব যুবক-কিশোর-মাঝবয়েসীদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম ভারতের উদ্দেশ্যে। যাবার সময় মা তার

আঁচলের গিট খুলে তার জোলাতি (জমানো) পয়সা মোট সাত টাকা বারো আনা ছিলো সবই দিয়ে দিলেন। সঙ্গে দিলেন কিছু চিড়া এবং আখের গুড়। বলা যায় একটি দেশ ছেড়ে অন্য একটি দেশে যাবার সম্বল ঐ-ই ছিলো যা আমার মা পুটলি বেঁধে হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

গায়ে জোশের কোন কমতি ছিলো না তখন। বলা যায় হুজুগে বাংগাল। টানা চার পাঁচ রাতের পায়ে হেটে অবশেষে চোত্রাখোলা সীমান্ত পার হলাম। আমাদের গাইডারের নির্দেশে মাঝপথে কোথায় কোথায় যেন কোন নির্জন খা খা করা ভুতুড়ে বাড়িতে আশ্রয় নিতাম। কালো মিশমিশে সেই অন্ধকার ঘরে দিনের সূর্যের আলোর সময়টি পার করতে হতো। সে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। অবশেষে পরম কাঙ্খিত সীমান্ত আমাদের নাগালে এলো। সীমান্ত পার হতেই সমস্ত শরীর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছে। যে যেখানে পারলাম শুয়ে পড়লাম।

রাত তখন মনে করি দু'আড়াইটা হবে। গভীর অন্ধকার রাত। যেখানে একটু উঁচু যায়গা পেয়ে শোয়ার আরামের জন্যে বালিশের মত মাথা ঠেকিয়ে শুতেই গভীর ঘুমে ডুবে গেলাম। সকালে রোদের তেজে ঘুম ভাঙতেই দেখি সেটি একটি কবর। হায়! খোদা। আসে পাশে চেয়ে দেখলাম ছোট বড় শত শত কবর। একটু দুরেই দেখলাম একটি কবরের পাশে একটি লাশ গায়ের মাংশ ছেঁড়া-ফাড়া অবস্থায় এলোমেলো পড়ে আছে। বুঝলাম লাশটি হয়তো চাপা কবর দেয়া হয়েছিলো আর পাহাড়ি শৃগালেরা ঐ লাশকে তাদের আহার বানিয়েছে। হায়রে! বাঙলার বনি আদম। এদিক ওদিক থেকে দমবন্ধ করা দুর্গন্ধ আসতে থাকে। সীমান্ত পার হওয়া আমাদের দলের লোকজন তখনও সেই শত শত কবরের মাঝেই গভীর ঘুমে অচেতন।

রাত মানেই আমাদের জন্যে তখন ছিলো দিন। ভারতে পৌঁছার পথে বার বারই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। যাতে বার বারই নির্ঘাত মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছি। এখনও বেঁচে আছি সেটা বলা যায় রীতিমতো একটি বিশাল বোনাস। সে বিপদের কারণ আমাদের স্বজাতি ভায়েরা মানে রাজাকার-আল বদর-আল শামস তখন সংখ্যায় এতো বেড়ে গিয়েছিলো যে, তাদের মাধ্যমে পাকসেনাদের ক্যাম্পে খবর পৌঁছে যেত বিদ্যুৎবেগে।

একটি বড় বিল পার হচ্ছিলাম এক কোমর সমান পানি ঠেলে ঠেলে। জলজ উদ্ভিদ আরালির ধারালো পাতায় কেঁটে যাচ্ছিলো পা হতে উরু পর্যন্ত। পঁচা শামুক আর কাটা পাটের ধারালো গোড়ার খোঁচায় পা কেটে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। থামার কোন উপায় নেই। কেননা গাইডারের নির্দেশে ধরে দেয়া একটি ছোট্ট সময়ের মধ্যেই সে স্থান পার হতে হবে নতুবা মহাবিপদ। দেরী হলে পাক-বাহিনীর কিংবা রাজাকারের গুলী খেয়ে জানটাই হারাতে হবে। আমরা একসঙ্গে প্রায় ৭০/৮০ জন কিশোর-যুবক বিল পার হচ্ছি। শত শত লাশ ভেসে আছে। লাশের গন্ধে নাক চেপে ধরেও কোন কাজ হচ্ছে না। লাশ ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি সেই ছেলে যে নাকি মৃত লোকের কথা শুনলেই রাতের ঘুম নষ্ট হয়ে যেতো। কোন কবরস্থানের পাশ দিয়ে দিনের আলোতেও একা চলতে পারতাম না ভয়ে। আর সেই আমি লাশ ঠেলে কোমর পানির বিল পার হচ্ছি। মনে বিন্দুমাত্র কোন ভয়ভীতি কাজ করছে না।

বিল পার হতেই রাতের আঁধারে যে সকল গ্রামবাসী পথের পাশে জগ ভর্তি পানি, রুটি, চিড়া-মুড়ি যার যা ছিলো তাই নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো আমাদের একটু সহযোগিতা করার জন্যে। আর মুখে বলছে ভগবান-ঈশ্বর-গড-আলার নিকট দোয়া করি বাজানরা তোমরাই আমাগো আশা। তোমরা যাও টেরেনিং নিয়া ঐ কুত্তাগুলাকে মাইরা-খেদাইয়া দেশটা স্বাধীন কর। আমাগোরে একটু শ্বাস নিবার দাও.....। কোন রকমে বাইচ্যা থাকার একটু ব্যবস্থা কইরা দেও.....। আহ্ তাদের সেই আন্তরিকতার মাঝে সেদিন কোন ঘাটতি ছিলো না। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ওদের মতো গ্রামবাসীরাই এমনিভাবে নয়টি মাস মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে। দেশবাসীদের সহযোগীতাতেই সেদিন মুক্তিযুদ্ধ এত শক্তিশালী, এত অপ্রতিরোধ্য হয়েছিলো। তাতে দিকে দিকে পাকসেনারা হতে থাকলো নাজেহাল, পর্যুদস্ত এবং ভীত-সন্ত্রস্থ।

মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীকে আরও প্রাণ চাঞ্চল্যে, সাহসে উজ্জীবিত করে রেখেছিলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটি যিনি সদ্য প্রয়াত এম, আর আখতার মুকুল ভাই। তিনি তাঁর রচিত ও কথিত ***চরমপত্র*** টি দিয়ে আমাদের তথা পুরো দেশবাসীকে সাহসে, নব নব উদ্দীপনায় বুক ভরে রেখেছিলেন। তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্যে আর একটি মুক্তিযুদ্ধের প্রামান্য দলিল গ্রন্থ *' আমি বিজয় দেখেছি'*। যে গ্রন্থ আমাদের ভুলে যাওয়া পথঘাট বারবারই দেখিয়ে দেবে অত্যন্ত বিশ্বস্থতার সঙ্গে। মনে করিয়ে দেবে ভুলে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধের সঠিক কথাগুলো। অথচ তিনিই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন পরপারে, ঝরে গেলেন নিদারুণ অনাদরে, অবহেলায়। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ও মাগফেরাত কামনা করছি।

জনাব *এম আর আখতার মুকুল* তিনি তাঁর মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন পূর্বে ২০০৪সালের ১০ এপ্রিল মুজিব নগর সরকার গঠনের ৩৩তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দৈনিক জনকণ্ঠের (১০এপ্রিল'০৪) *চতুরঙ্গ* বিভাগে একটি কলাম লিখেছিলেন। যার শিরোনাম ছিলো *'প্রবাসী*

মুজিবনগর সরকার গঠনের নানা অজানা তথ্য' .... সেও তো আজ প্রায় ৩৪ বছর আগেকার কথা। ১৯৭০ সালে অবিভক্ত পাকিস্তানে সামরিক প্রহরায় অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকার করেন।

শুধু তাই-ই নয়, ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় বাংলাদেশে গনহত্যার দলিল 'অপারেশন সার্চলাইটে' দস্তখত করে করাচীতে পলায়ন করেন। এই গনহত্যার মোকাবিলায় ২৫ মার্চ গভীর রাতে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, এই ঘোষণার মাত্র ১৬ দিনের ব্যবধানে ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) গঠিত হয়েছিল। আজ ২০০৪ সালের ১০ এপ্রিল সেই মুজিবনগর সরকার গঠনের ৩৩তম বার্ষিকী........।।

ভারতে পৌঁছার পর চোত্রাখোলা নামক সেই সীমান্তবর্তী এলাকা হতে বাসে করে পাহাড়ের কোল বেয়ে বেয়ে রাজনগর, রাধানগর হয়ে পৌঁছে গেলাম কাঠালিয়া। সেখানে আমাদের বিস্তারিত রেকর্ড করা হলো। তৈরী হলো পুলিশ কার্ড। এখানে একদিন থাকার পর পাঠানো হলো মাচিমারা ক্যাম্পে। সেখানেও একদিন থাকার পর পাঠানো হলো আগরতলা কংগ্রেস ভবনে। সেখানেও বিভিন্ন রেজিস্টার বুকে লিপিবদ্ধ করা হলো আমাদের সকল ডাটা। এর পর সেদিন বিকেলেই আমাদের পাঠানো হলো আগরতলা শহরের অদুরে আমতলীর ইয়থ ক্যাম্পে।

আগরতলার উত্তরে প্রায় ৪/৫ কিলোমিটার দুরে আমতলী এলাকায় পৌঁছার পর সেই ছোট্ট পাহাড়ি শহরের ছোট-বড় পাহাড়ের উপর বেশ কয়েকটি ইয়থ ক্যাম্প নজরে এলো। যার একটির নাম ছিলো *বঙ্গ শার্দুল* ইয়থ ক্যাম্প। সেখানেই আমাদের থাকার জন্য সিলেক্ট করে দেয়া হয়েছে সেই আগরতলার কংগ্রেস ভবন হতে। তার আশে পাশের পাহাড়ের চূড়ায় আরও কয়েকটি ইয়থ ক্যাম্প যেগুলোর নাম রাখা হয়েছিলো আমাদের দেশের নদীগুলোর নামের সঙ্গে মিল রেখে। যেমন পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা ইত্যাদি।

সেই ইয়থ ক্যাম্পগুলোর অদুরে ছোট ছোট পাহাড়ের কোল ঘেষে যেখানে-সেখানে যত্রতত্র হাজার হাজার পরিবার পলিথিন এর ছাউনী ও সামান্য ঘের দিয়ে কিছুটা মাথা গোজার ব্যবস্থা করে পড়ে আছে। এ সকল শরণার্থী বাংলাদেশ থেকে এসেছে। জেনেছি শুধুমাত্র পাকবাহিনীর সেই বর্বরোচিত অত্যাচারের ভয়েই জান বাচিঁয়ে এক কোটিরও বেশী বাঙালি শরণার্থী সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। যাদের খাওয়া-থাকার পুরো দায়-দায়িত্ব তখনকার ভারত সরকারের ঘাড়ে চেপে বসে।

এই বিশাল জনগোষ্ঠির ভার বহন করা ভারত সরকারের পক্ষে রীতিমতো দুরুহ হয়ে পড়ে। সেখানে তখনও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। তার জন্যে প্রকৃত বিষয়টিকে আন্ত-র্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে এনে তাদের সমর্থন পাওয়াও বেশ সময়ের ব্যাপার। তাইতো অর্ধাহারে অনাহারে হায়রে! সেখানে পাইকারী দরে মেয়ে মহিলারা ইজ্জতের বলি দিতে দেখেছি। হায়রে! অভাগা দেশের অভাগা মানুষ! প্রচন্ড মনোকষ্টে বারবারই কিশোর মনে প্রশ্ন জেগেছে আমাদের এই জাতির কষ্টের কী শেষ নেই?

আমাদের ইয়থ ক্যাম্পে সকালে একমুঠো চিড়া আর কয়েকটি বাতাশা দিয়ে নাস্তা দেয়া হতো টানা একঘন্টা শরীর চর্চার পর। দুপুরে একমুঠো ভাত ও ডাল। রাতে একটি রুটি আর কিছু ডাল। ডাল এবং রুটি উভয়ের মধ্যেই কঙ্কর ও করাতি বালু থাকতো। যা কোনভাবেই খাওয়ার উপযুক্ত নয়। তবুও যাই পেতাম তাতে কারোই পেট পুরতো না। পঁচা চাউলে পোকা, করাতি বালু সব সময়ই চোখে পড়তো। তারপরও কোনভাবে কিছু খেয়ে পাহাড়ি ঝরণার পানি খেতাম পেট ভরে। যা খেয়ে খেয়ে একদিন রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। তেমনি আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলো ক্যাম্পের প্রায় অনেকেই।

দিন যেতে থাকে এমনিভাবে। চিন্তা একই- কবে ট্রেনিং নিয়ে দেশের মাটিতে ফিরে যাবো এবং দেশের জন্যে কিছু কাজ করতে পারবো। খবর এলো একদিন মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এম এ জি ওসমানী ইয়থক্যাম্পগুলো ভিজিটে আসছেন। আমরা জড়ো হলাম তিতাস ক্যাম্পে। আমাদের দলনেতা আমাদের সবাইকে সেনাবাহিনীর স্টাইলে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। শাদা তলোয়ারী গোঁফের সেই মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক সৌম্যমুর্তির এম এ জি ওসমানী এলেন। লাইনে লাইনে ঘুরে ঘুরে সবাইকে দেখলেন। কুশল জিজ্ঞেস করলেন। জেনারেল ওসমানীকে কাছে থেকে সেটাই আমার প্রথম এবং শেষ দেখা।

অবশেষে সবার উদ্দেশে সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানী বললেন- তোমরা অপেক্ষা কর। আমাদের কাছে এখন হাতিয়ার নেই। সহসাই হাতিয়ারের একটি বড় চালান পাবো বলে আশা করি। তখন তোমাদের ট্রেনিংএ নেয়া হবে। আমাদের দেশটির জন্যে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হবে। অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। অনেক হারাতে হবে। স্বাধীনতা খুব সহজে আসে না। ইহা সহজলভ্য

ছেলের হাতের মোয়াও নহে। তার জন্য লাখো বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে হয়। আমাদের এই অভাগা দেশটার মাটি এখন চরম রক্ত তৃষ্ণায় ছট্‌পট্‌ করছে। তাই এখন থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত হও। নিজেদের শক্ত কর। হয়তো বহুদিন, হয়তো বহুমাস-বছর ধরে তোমরা শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

সেই দেখাই জেনারেল ওসমানীকে আমার শেষ দেখা। দেশ স্বাধীন হবার পর ওনাকে আর দেখার সুযোগ হয়নি। সেখানে আমাদের সেই ইয়থ ক্যাম্পগুলোতে বিভিন্ন এলাকার ছাত্র নেতারা এসেছেন বিভিন্ন সময়ে। নিজেদের এলাকার ছেলেদের বেছে বেছে নিয়ে গেছেন। আমাদের এলাকারও ছাত্র নেতা, পাতি নেতা এবং বড় নেতারাও গিয়েছিলেন। কিন্তু তারা মুষ্টিমেয় কয়েকজন তাদের চেনাজানা ছেলে বেছে নিয়ে গেছেন। আমাদের পরিচয় পেয়েও অবহেলায় পাশ কাটিয়ে গেছেন। বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেয় তারা আমাদের জন্যে কোন ব্যবস্থা করলেন না।

তারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং ক্ষমতা লাভের বিভিন্ন অলিগলি খুঁজেই ব্যস্ত থাকতেন। তাদের মধ্যে চাঁদপুরের মিজানুর রহমান চৌধুরীও ছিলেন। স্বাধীনতার পর যিনি এ দেশটিতে বহু বড় বড় আসন অলংকৃত করেছিলেন। এমনকি তখনও তিনি চাঁদপুরের জন্যে উলেখ করার মতো তেমন কিছুই করেন নি। যদিও চাঁদপুরবাসী তাকে বার বারই নির্বাচিত করে সুযোগ দিয়েছেন। উপযুক্ত সম্মান দিয়েছেন। মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কি চাঁদপুরবাসীদের সে সম্মান-মর্যাদা রক্ষা করেছেন? এরা দেশ-জাতির জন্যে কখনও রাজনীতি করেননি। রাজনীতি করেছেন নিজের জন্যে। তাই নিজেকে নিয়েই সব সময় ব্যস্ত থেকেছেন। সবার বেলায় না হলেও অধিকাংশ রাজনীতি-খোর্‌দের বেলায় আমার এই একই কথা। যা আমি রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা ও চরম বাস্তবতা হতে অর্জন করেছি।

দেখতে দেখতে তিনটি মাস পার হয়ে গেল। আমাদের জন্যে কোন নতুন খবর নেই। ক্যাম্পের দু'তিনজন যুবক পাহাড়ী রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। তাতে আমাদের মানসিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। আমরা অস্থির হয়ে পড়লাম দেশে ফেরার জন্যে। ক্যাম্প চীফকে বার বার তাগাদা দিতে থাকলাম আমাদের জন্যে কিছু করার জন্যে। কেন না আমরা কেউই পাহাড়ী রোগের সাথে যুদ্ধ করে মরতে চাই না। যদি মরতেই হয় তবে দেশের জনগণের জন্যে কিছু করেই মরতে চাই। দেশকে স্বাধীন করতে চাই। দেশে গিয়ে নাপাক সেনাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাদের দু'চারটি এবং তাদের দালাল কিছু রাজাকারকে মেরে একটু শান্তি নিয়ে মরতে চাই।

পরে আমাদের ক্যাম্প চীফ সম্ভবত: ওনি ছিলেন সিলেটের দেওয়ান আবুল আব্বাস (তখনকার ছাত্রলীগের ছাত্র নেতা হবে হয়তো) কিছু দিন একটি গাদা রাইফেল দিয়ে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করলেন। সাথে কোথাও হতে যেন ঝংধরা একটি স্টেনগান ব্যবস্থা করে তা চালানো এবং গ্রেনেড ছোড়াও শেখালেন। একদিন সকালে আমাদের সেই ক্যাম্পচীফ এক্সারসাইজ ফিল্ডে বললেন- এবার তোমরা যদি কেহ দেশে ফিরে যেতে চাও, তা নিজ দায়িত্বে যেতে পার। তবে এভাবে তোমাদের দেশে ফেরত পাঠানো *হাই কমান্ড* থেকে কোন অর্ডার নেই।

তোমাদের মাঝে যারা দেশে ফিরে যেতে চাও। তারা সবাই দরখাস্ত জমা দাও। আমি *'হাই কমান্ড'* থেকে মঞ্জুর করিয়ে আনার চেষ্টা করবো। তবে একটি কথা মনে রেখ, তোমরা দেশে ফেরার সময় কোন হাতিয়ার পাবে না। কেননা আমাদের ষ্টকে কোন হাতিয়ারই নেই। দেশে গিয়ে আল বদর আর রাজাকারদের কাছ থেকে হাতিযার কেড়ে নিয়ে দেশের জন্যে কাজ করবে। এ ক্ষেত্রে একটা বিশেষ কথা জেনে নাও, দেশের ভেতরে মুক্তি বাহিনীরা নিজেদের স্বার্থে সেখানকার কিছু লোকদের বিশেষ ক্ষেত্রে রাজাকার বানিয়েছে। যারা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে কাজ করে যাচ্ছে অতি নীরবে। সাবধান! গরম মস্তিস্কে হঠাৎ করেই কোন সিদ্ধান্ত নিবে না......।।

দরখাস্ত জমা দিলাম। প্রায় প্রতিদিনই ক্যাম্প চীফ এর নিকট জানতে চাই। কী খবর। না। তিনি কোন খবর দিতে পারেন নি। অবশেষে প্রায় বারো তের দিন পরে খবর এলো আমরা যাবার জন্যে তৈরী হতে। ক্যাম্প চীফ আমাদের কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে বললেন-ঐ কাগজপত্র সাথে না থাকলে ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী তোমাদের আটক করবে। দেশে যেতে দেবে না। কেননা তারা ভাববে তোমরা গুপ্তচর। তিনি এও বলে দিলেন সীমান্ত পার হবার পর সে কাগজপত্র আর যেন সাথে না রাখি। কেননা বিভিন্ন জায়গায় পাক-রাজাকারদের চেকে ধরা পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু। - 'মনে রাখবে- তোমরা সাধারণ নাগরিক, দেশে ফিরে যাচ্ছো। চাষা-ভুষার বেশে কোন বুড়ো লোকের নাতি হিসেবে পথ চলবে। আপাতত: দেশের ভেতরে যারা আছে তাদের সহজে বিশ্বাস করবে না। তাই বলে দেশের ভেতরে যারা আছে, তারা সবাই কিন্তু পাকিস্তানের দালাল নয়। তবুও বুঝে-শুনেই পা বাড়াবে'। এটা আমার দায়িত্ব ছিলো তাই বলে দিলাম।

নিজেদের গোছগাছ করে নিচ্ছি দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে। এরি মাঝে ঘটে গেলো আর এক অনাকাঙ্খিত ঘটনা। ক্যাম্প গরম হয়ে উঠলো একটি বিশেষ খবরে। আর তা হলো একজন গুপ্তচর ধরা পড়েছে। যে নাকি আমাদের আশে-পাশের সকল

ইয়থ ক্যাম্পের খবরা-খবর, লোকেশান, দুরত্ব সংগ্রহ করতে এসেছে পাক হানাদারদের জন্যে। আমাদের ক্যাম্পে আমার সাথে আরও দু'তিনজন চাঁদপুরের লোক ছিলেন। তাদের বললাম চলুন দেখে আসি গুপ্তচর দেখতে কেমন। তারা ক্লান্তি ও ভয় জড়ানো কন্ঠে বললো- গুপ্তচর দেখে কাজ নেই। তোমার সখ থাকলে নিজে গিয়ে দেখে এসো। কেউ যখন রাজী হয়নি, তখন আমার কৌতূহল মেটাতে নিজেই গেলাম।

গেইটে গিয়ে সেন্ট্রিকে বললাম- ভাই যে গুপ্তচরটি ধরা পড়েছে সে কোথায়?

সেন্ট্রি বললো- তাকে হাত-পা বেঁধে ঐতো সামনের ঘরটিতে ফেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু তোমার অত জানার দরকার কি? যাও ব্যারাকে ফিরে যাও।

আমি তাকে মিনতি করে বললাম- আমার জীবনে এই শব্দটি বহুবার শোনেছি কিন্তু চোখে আজও দেখলাম না। আপনি দয়া করে একটু সুযোগ দিলে আমার কৌতূহলটা মেটাতে পারি।

সেন্ট্রি বললেন- কমান্ডারের অর্ডার বন্দীর সঙ্গে কাউকে দেখা করতে না দেয়া। ক্যাম্প চীফ কলিকাতা গিয়েছেন। কাল ওনি ফিরে আসবেন। ওনি আসলেই সিদ্ধান্ত হবে এই *স্পাই*কে কী করা যায়। ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তোমাকে কমান্ডারের অনুমতি আনতে হবে।

হঠাৎ কানে ভেসে এলো একটি নারী কণ্ঠ। যাতে কিছু কান্নার কাত্‌রানি ভেসে এলো।

সেন্ট্রিকে জিজ্ঞেস করলাম- এখানে মেয়েলোকের কান্নার শব্দ শোনা গেলো মনে হচেছ।

সেন্ট্রি বললো- ওইতো সেই গুপ্তচর মহিলা। পাকিস্তানীদের গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে। তাকে আমরা কাগজপত্র সহকারে ধরেছি। পেয়েছি তার কাছে অনেক নকশা।

আবার অনুরোধ করলাম আমাকে পাঁচটি মিনিট সুযোগ দিন। আমি ওর সঙ্গে কোন কথা বলবো না। একটু দেখতে চাই পিজ ভাই একটু...।

সেন্ট্রির সাথে গত তিনমাসের পাহাড়ী ইয়থ ক্যাম্প জীবনে একটি ভালো হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিলো আমার। তবুও সেদিন সে এত কঠিন কেন ছিলো বুঝে উঠতে পারি না। আমার অবিরাম অনুরোধের কাছে শেষ পর্যন্ত সে রাজী হয়ে আমাকে নিয়ে সেই বন্দীশালায় ঢুকলো। প্রায় পাঁচ ফুট পাঁচ - ছয় ইঞ্চির লম্বা সুন্দরী পাতলা গড়নের এক মহিলা দেখে আমি থমকে গেলাম। তাহলে এদেরই বলে গুপ্তচর!? তার পড়নে প্যান্ট ও সার্ট, মাথায় চুলের বয়কাট। আমিতো রীতিমতো অবাক বিস্ময়ে দেখছি! আরও বিস্মিত হলাম যে, তার ভয়ভীতি এবং অনুশোচনা বা মুক্তি পাওয়ার কোন আকুতি তার চোখে মুখে বিন্দুমাত্র প্রকাশ পায়নি। কিছু কথা বলতে চাইলে সে প্রথমে অনর্গল উর্দুতে বললো পরে আবার ইংরেজীতেও বললো। আমি ইংরেজীতে দু'চারটি শব্দ বোঝলেও উর্দুতে সে কি বলেছিলো তার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝি না। ইংরেজী কথাগুলোর অর্থ যা বুঝলাম- সে আমাদের ক্যাম্পচীফ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে কোন কথা বলতে পছন্দ করে না।

সে ঘটনায় আমাদের ক্যাম্প থেকে *রিলিজ অর্ডার* পাওয়া যাচ্ছিলো না। যার জন্যে আমরা সমস্ত কাগজপত্র পাওয়া সত্বেও বেরুতে পারছিলাম না। পরে সে গুপ্তচর মহিলার কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো তা আর জানি না। কিন্তু তার একদিন পরই আমাদের সেই ইয়থ ক্যাম্পগুলোকে লক্ষ্য করে কুমিলার সীমান্তবর্তী কোন স্থান হতে মর্টার আক্রমন করেছিলো পাক-সেনারা। যাতে অনেক লোকজন হতাহত হয়েছিলো। এতে ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে পড়লো সবাই। আমরা আরো অস্থির হয়ে পড়লাম। কবে নাগাদ এ বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশে গিয়ে কিছু কাজ করতে পারবো।

বেশ কিছু দিন হলো আমাদের এলাকা থেকে আসা এক লোকের মাধ্যমে বাড়ির খবর পেয়ে মনটি এমনিতেই বিষাদে ছেয়ে আছে। বিশেষ করে বড়ভাই নাকি কোথাও যুদ্ধে পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে। সে থেকে তার আর কোন খবর নেই। তাতে মা তো ধরেই নিয়েছে যে, পাকবাহিনী তাকে মেরে ফেলেছে। তারপর আমিও ভারতে এলাম প্রায় তিনমাস। ভেবেছি এলেই মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং নিয়ে নিজ এলাকায় গিয়ে কিছু একটা করবো। সে চিন্তায়ও ছেদ পড়লো। হাতিয়ার নেই বলে। দেশেও কোন খবর পাঠাতে পারছি না যে - 'আমি বেঁচে আছি এবং ভালো আছি'। তাহলে খামোখাই ভারতের পাহাড়ে পড়ে থেকে অস্বাস্থ্যকর খানা খেয়ে ধুঁকে ধুকে মরার কোন অর্থ খুঁজে পাই না। এক একটি দিন যেন এক একটি যুগ।

অবশেষে যেদিন ছাড়া পেলাম। তখন সময় বিকেল প্রায় সাড়ে তিনটা। ১১ / ১২ জনের একটি গ্রুপ নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পকেটে আছে শুধু একপ্যাকেট টেন্ডু পাতার গনেশ বিড়ি এবং একটি মেচ। আর দুই টাকা এগার আনা। সেই মাস তিনেক পূর্বে ভারতে আসার সময় মা তাঁর আঁচলের গিঁট খুলে যা দিয়েছিলেন তার থেকে এখনও এই পয়সাগুলো টিকে আছে আমার কাছে। বলা যায় বিদেশ মানে ভারত থেকে নিজ দেশে রওয়ানা দেবার সময় আমার কাছে ঠিক ঐ পয়সাগুলোই ছিলো। যা এখনকার সময়ে সবার কাছেই হাস্যস্পদ মনে হতে পারে। বিড়ির কথা এজন্যেই লিখলাম তখন পাহাড়ী ক্যাম্পের চরম শীতে সহপাঠীদের বিড়ি টানা দেখে দেখে এবং তারা মাঝে মধ্যে দু'চারটা টান দিতে দিলে তাতে বেশ মজা পেতাম। আর সে থেকেই ধুম পান শিখে ফেললাম। যে বাজে অভ্যেসটা আর ছাড়তে পারি নি।

ভারতের অংশে বাসে কিংবা ট্রামে যে যান-বাহনেই উঠেছি তারা যখন জেনেছে আমরা জয় বাংলার মানুষ এবং ট্রেনিং শেষে দেশে ফিরছি। তারা কেউ আমাদের কাছে কোন ভাড়া নেয়নি। এমনি সুযোগ-সুবিধা সর্বত্রই পেয়েছি। ভারতের যেখানেই গিয়েছি সেখানকার জনগণের আন্তরিক সহযোগিতার কথা আমি কখনোই ভুলবো না। বিশেষ করে তাঁদের সরকার আমাদের যে এককোটিরও অধিক লোককে তাদের দেশে প্রবেশের সুযোগ দিয়ে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। তাদের দেশে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছেন। সর্বাত্মকভাবে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছেন। যার ফসল আমাদের এই স্বাধীনতা। তাঁদের সেই উদারতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয়। অন্তত: যারা সঠিক ইতিহাস জানি।

অবশেষে সাত আট দিনের পায়ে হাটায় চাঁদপুর জেলার সীমানার মধ্যে এসে পৌছি। এখানে এসে দেখলাম পায়ে পায়েই বিপদ। প্রথমেই চিন্তা মায়ের সাথে দেখা করা। তারপর শুরু করবো দেশের জন্যে কাজ। কেন না ভারতে থাকতেই জেনেছি মায়ের অবস্থা খুবই খারাপ। তিন ছেলের দুই ছেলেই লাপাত্তা। সে মা ঠিক থাকে কীভাবে! বার বারই আমার লেখায় শুধু মায়ের নামই আসে। পিতার নাম কেন আসছে না। এ প্রশ্ন জাগতে পারে সুপ্রিয় পাঠক মনে। কেননা আমি এতিম হয়েছি সেই শৈশবেই। যখন মা আরো জেনেছেন আমাদের গ্রুপের শেষ হয়ে যাবার খবর। আমাদের এলাকার আরো কয়েকজন কিশোর যুবক গিয়েছিল সে সময় ভারতের বর্ডার পার হতে আমাদের সঙ্গেই। বর্ডারের গোলাগুলী উপেক্ষা করে আমরা পার হয়ে গেলেও তারা পেছন থেকে পালিয়ে ফিরে এসেছে। এবং এলাকায় ফিরে এসে আমার মাকে জানিয়েছিলো যে, হয়তো আমি বা আমাদের গ্রুপে যারাই ছিলো তারা সম্ভবত: সবাই শেষ। আর তেমন খবরে মায়ের মনে যে সময়ের সাড়াশী চেপে ধরেছে। তাতেই ওনার শারিরীক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে।

সীমান্ত পার হবার সময় আমাদের পেছন থেকে পালিয়ে আসা সেই কিশোর-যুবকরা পরে কেউ কেউ রাজাকার এবং ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সেজে অনেক অঘটনের নায়ক হয়েছে। স্বাধীনতার পরে কোত্থেকে যেন সেই তারাই মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে অত্যন্ত তড়ি-ঘড়ি। আর হাতিয়ে নিয়েছে তখনকার ব্যাপক সুবিধা। কেউতো একেবারে রাতারাতি হাতিতে পরিণত হয়েছে! আমি বা আমার মতো গো-বেচারা কিশোর মুক্তিযোদ্ধারা হাতিয়ার ফেলে যখন শিক্ষাঙ্গানে বই-খাতা নিয়ে ঘুরছি। তখনও সেই পেছনের পালিয়ে আসা কাপুরুষগুলো হাতিয়ার নিয়ে বিভিন্ন কলংকের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। টাকা কামানো এবং ভুয়া সার্টিফিকেট সংগ্রহে তারা ছিলো মহাব্যস্ত। সময়ে তারাই হয়ে যায় সমাজের, দেশের কর্তাব্যক্তি। বড় বড় নেতা ও মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ (!?) হায়! দুর্ভাগা বাংলাদেশ ও তার দুর্ভাগা জনগণ। যার ফসল দেশটা স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পরও আকণ্ঠ দুর্ভোগে ডুবে আছে।

চাঁদপুর এলাকায় পৌঁছে যে যার গন্তব্যের উদ্দেশে চলে গেলো। কোন কথা হলো না আবার কোথায় আমরা মিলিত হবো এবং তা কবে। এ সবের দরকারও ছিলো না। কেননা ভারত থেকে বেরুবার সময়ই আমরা জেনে এসেছি, ভারত সহসাই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সরাসরি সাহায্য করবে। আমাদের দেশটাকে ‘ডিকলারেশান’ দেবে। অতএব সহসাই আমাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত। এখন ভাবনা শুধু যেভাবে পারি দেশের জন্যে কিছু কাজ করা। পথে পথেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কীভাবে কাজ করবো। যেহেতু আমরা ছোট্ট কিশোর তাই মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করবো বিভিন্নভাবে।

চাঁদপুরের বাবুর হাট এলাকা পার হতে হবে মেইন রোড ধরে। তাতে আবার একটি ব্রিজ রয়েছে। যেখানে রয়েছে রাজাকার ও পাকসেনাদের ক্যাম্প। অতএব সে পথে পার হওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এক বৃদ্ধলোকের সঙ্গে কথা বললাম। তাকে বিশ্বাস হয়ে গেলো। তাই তাকে অনুরোধ করে বললাম- চাচা আমরা এ রাস্তা দিয়েই আমাদের গ্রামে যাবো। বিকল্প কোন পথ নেই। আমরা ভারত থেকে এসেছি। আপনি কি আমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারেন?

কেননা শোনেছি পথে একটি ব্রিজ আছে এবং সেখানে পাকবাহিনীর ক্যাম্প আছে সঙ্গে রাজাকারও। আমাদের সাথে কোন হাতিয়ার নেই। আমরা দু’জই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। তাই তারা কিছু জিজ্ঞেস করলে আপনি বলবেন যে- এরা দু’জনই আমার ছেলে। এরা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াতে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।

তিনি বললেন - বাজান এইডা বড়ই বিপদের কাম। তবুও চলো। শুধু আলাহর উপরই ভরশা কর। আমরা সেই চাচার সঙ্গে কথিত ব্রিজটি পার হতে পা বাড়াই। তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে পাকিস্তানি সেনারা আমাদের দাঁড় করিয়ে কি যেন উর্দুতে জিজ্ঞেস করলো তার কিছুই বুঝি না। আমাদের গাইডার সেই চাচা ওদের বললেন-এ দুইটা হামারা লারকা আছে। হাসপাতাল মে লেকে যাতা হ্যায়। ওদের রোগ-বিমার আছে।

ব্যস! চাচার সেই বাংলা মিশ্রিত উর্দুতেই কাজ হলো। অন্যদিকে এই পথে চাচা সবসময়ই চলাচল করেন বলে পাকিস্তানী সেনারা তাকে চিনে-জানে এবং বিশ্বাস করে। কিন্তু তাদের সঙ্গের দু’জন রাজাকার

এসে বললো- চাচা আমাদের সন্দেহ হয়, এরা তোমার ছেলে কিনা। আমাদের মনে হয় ওই সাহা বাড়ির ছেলে এরা। যাদের বাড়িটি আমরা এ দু'জনে দখল নিতে যাচ্ছি দু'চার দিনের মধ্যেই। আজ তুমি তাদের পার করে দিচ্ছ ছেলে বলে....। ওকে ! ওরা যদি মুসলমান হয় তাতে তোমার কথাই আমরা মেনে নেব। নতুবা এখনই গুলি করে ব্রিজের নিচে ফেলবো। আমরা আমাদের এই পবিত্র পাকিস্তানে কোন কাফেরকেই রাখবো না।

তখন আমাদের দু'জন কিশোরের অবস্থা শ্বাস বন্ধ হবার মতো । ওদিকে পাকসেনাটি রাজাকার দু'জনের উদ্দেশে বলছে - বাইনসোত্ বুড্ডা বেচারাকো কিও খামোখা তাং কররাহাহো? ওহ্কো ছোড়দে...যানে দে......। কিন্তু রাজাকার দু'জন নোছোড় বান্দা। সে দু'জন রাজাকারকেই আমি মোটামুটি জানি। ভাগ্যিস সেদিন ওরা আমাকে চিনতে পারেনি। পারলে নির্ঘাত ওদের গাদা রাইফেলের গুলিতে আমাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতো। এখানেও জীবনটা আবার বোনাস হিসেবে পেলাম। রাজাকারদের একজন চান্দ্রা বাজার এলাকার এক হাই স্কুল শিক্ষকের ছেলে সালেহ আহমদ। তার বাপ উত্তর বঙ্গের কোন একটি জেলায় এক হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নাকি উপ-প্রধান হিসেবে আছে জানি।

ভাবছি একজন আদর্শবাদী শিক্ষকের ছেলে আজ রাজাকার বা পাকিস্তানের দালাল?! কীভাবে তা সম্ভব হলো!? জেনেছি এলাকার মধ্যে সেই সালেহ রাজাকার সবচে' বেশী অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। যার জন্য তাকে দেখার পর থেকে আমি নিজেও খুব '*নার্ভাস ফিল*' করছিলাম। সে আমাদের কাপড় খুলে পুরুষাঙ্গ দেখাতে বলে। পুরষাঙ্গ দেখেই সে নিরুপন করবে আমরা কাফের না মুসলমান!

হায় খোদা! এবার বাঁচতে হলে পুরুষাঙ্গ দেখাতেই হবে। সেখানে আমাদের কোন পছন্দ নেই। অগত্যা কাপড় খুলে দেখাতেই হলো। ওরা দু'জনই বেশ মজার হাসি হাসলো বলে মনে হলো। পরে তারা আমাদের সঙ্গের সেই বুড়ো চাচাকে বললো - যাও চাচা তোমারা দুই বেটাকো লিয়ে যাও........।।

সেই দু'জন রাজাকারের একজন সালেহ আহমেদ। ডিসেম্বরের (১৯৭১) প্রথম সপ্তাহ থেকে তাকে বহু খুঁজেছি। কিন্তু তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারপর যখন যুদ্ধ শেষে হাতিয়ার ফেলে বই হাতে তুলে নিই। শিক্ষার রেলিং ঘুরে ঘুরে একদিন নিজেও কর্মজীবনে প্রবেশ করি। তখন একদিন বাই দ্যা বাই জানতে পারি, সেই সালেহ আহমেদ দেশ স্বাধীন হবার পূর্বেই চাঁদপুর ছেড়েছে।

ঢাকায় নাকি উত্তর বঙ্গের কোন স্থান থেকে পড়াশোনা করেছে। তখনকার বাংলাদেশ সরকারের কোন বিশেষ বিভাগে চাকুরীও করেছে। তারপর সময়-সুযোগ নিয়ে মানে দলীয় ক্যাডার হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে সুযোগ পেয়ে সে চলে গিয়েছে। তবে জেনেছি ঢাকায় বুদ্ধিজীবি নিধনে কুখ্যাত ক্যাডারদের মধ্যে সে খুবই দক্ষ এবং অগ্রগামী ছিলো।

দলের বিশ্বস্থ একজন হতে পেরেছিলো বিধায় বিনা খরচে মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার সুযোগ পায়। বিদেশ গিয়েও নাকি জামাতের রাজনীতিতে সংশিষ্ট। প্রবাসে বাঙালি কমিউনিটির একজন পাতিনেতা হতে পেরেছে। জামাতে ইসলাম ওরফে পলিটিক্যাল ইসলাম এর জন্যে সে এক অনন্য নিবেদিত কর্মী।

চাঁদপুর মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে চাঁদপুরের চর এলাকার কুখ্যাত চোর *আইল্যা চোরা* কে খুঁজে বের করে মুক্তিবাহিনীর লোকেরা আটক করে।। কেন না মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস সে আল-সাম্‌স বাহিনীতে যোগ দিয়ে নিরিহ লোকের উপর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়েছিলো। তাকে চাঁদপুর থানার সামনে ছাগলের দড়ি দিয়ে বেঁধে টাঙ্গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণ মিলে পিটিয়ে পিটিয়ে মারতে থাকে। এবং চাঁদপুরের আর এক ব্যবসায়ী শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান লতিফ খন্দকারকে যখন আমাদের চাঁদপুরের শহরবাসী এবং মুক্তিযোদ্ধারা তার শাস্তি হিসেবে চাঁদপুর টাউন হলের ছাদ থেকে লাথি মেরে নিচে ফেলে দিয়েছিলো লাখো জনতার সামনে। সেই সালেহ আহমেদকে পাওয়া গেলে আমিও সেই একই ব্যবস্থা নিতাম। তার ভাগ্য ভালো ছিলো নির্দ্বিধায় বলা যায়। তবে আমি মনে করি এখন আবার সময় এসেছে সেই কুখ্যাত ক্যাডারকে খুঁজে বের করার। এখন যারা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়নের কথা বলেন, তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা সজাগ। এই সেই তারা যারা বাংলাদেশের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে খুঁজে বের করে মুক্তিযোদ্ধা মুক্ত বাংলাদেশ বানাতে চান। কিন্তু আমরা সচেতন জনগণ চাই রাজাকার মুক্ত বাংলাদেশ। তাই আজ বিশেষ জরুরী রাজাকারদের তালিকা প্রণয়ন।

সেই মহাবিপদসঙ্কুল ব্রিজ পার হতে পেরে মনে হয়েছিলো যেন পুলছেরাতই পার হয়ে এলাম। কেননা তখনকার দিনে এই সকল ব্রিজের পাশে থাকতো পাক-রাজাকার ক্যাম্প। এই পাক-রাজাকাররা তখন কত নিরীহ বাঙালিকে যে খামোখাই গুলি করে ফেলে দিতো এই সকল ব্রিজের নিচে। তার কোন ইয়ত্তা নেই। হায়! বাঙলার সেই নিদারুণ কলংকিত এবং কলুষিত সময়!!

আমাদের গাইডার চাচা ব্রিজ পার হতেই পাশের বাবুরহাট বাজারে আমাদের নিয়ে যান। বাজারে গিয়ে

একটি ভাঙ্গাচোরা রেষ্টুরেন্টে ঢুকেই বিচি কলা এবং মুড়ি কিনে দিয়ে বললেন- খাও বাবারা। কানের কাছে একটু ঝুকে এসে তিনি বললেন - তোমাদের মুখ দেখে মনে হয় দু'তিন দিন কিছুই খাওনি। সত্যিতো গত দু'দিন কিছুই খেতে পাই না। সামনে যা পেলাম গোগ্রাসে তা গিলে পানি খেলাম। মনে হলো আবার প্রাণশক্তি ফিরে পেলাম। সেই বিচি কলা আর মুড়ি আমাদের কাছে মনে হয়েছিলো যেন অমৃত। ফিরে পেলাম আবার কেরোশিন শিখার মতো নিভু নিভু প্রাণটি।

এবার চাচা আস্তে আস্তে বলতে থাকলেন- আমার একমাত্র ছেলে রহমত মুক্তি বাহিনীতে গিয়েছিলো। একটি অপারেশানে গিয়ে গুলীবিব্ধ হয়ে মারা যায়। সে থেকেই তোমাদের মত কাউকে পেলে নিজের ছেলেই মনে হয়। তাই জীবন দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করি। কথাগুলো বলতে বলতে চাচা কেঁদে ফেললেন। বাবা আমি একজন সাধারণ ফ্রি স্কুল মাষ্টার। তোমাদের কোন ধরনের সাহায্য লাগলে আমারে খবর দিও। আমি জান দিয়ে তোমাদের সাহায্য করার চেষ্টা করবো। কেন না আমার ছেলে শহীদ হবার পর আমি মনে করি সমস্ত মুক্তিবাহিনীর ছেলেরাই আমার ছেলে। বলার অপেক্ষা রাখে না এমন পিতাদের সাহায্যেই সেদিনের মুক্তিযুদ্ধ পেয়েছিলো সীমাহীন গতিশীলতা।

অবশেষে পৌঁছলাম বাড়ি। মায়ের মুমুর্ষ অবস্থা দেখে একেবারেই ঘাবড়ে যাই। আমাকে পাওয়ার পর মা আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠেন। মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের খোঁজে বেরুলাম। বহু দুরের গ্রামে গিয়ে পেলাম সে খোঁজ। তাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে লাগলাম। তাতে মনে কিছুটা তৃপ্তি পেলাম।

অন্তত: কিছু করতে পারছি দেশের জন্যে এটাই শান্ত না। কাছাকাছি আছি বিধায় মাকে মাঝে মধ্যে রাতে এসে দেখে যাই। মা যে এলাকায় ছিলেন মানে যে আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলেন সেখানে কখনই পাক সেনারা যেতে সাহস পায় না। দু'তিন বার তারা নদী পথে এলেও আর ফিরে যেতে পারেনি। মুক্তিবাহিনীর ক্যাচ্কি মাইরে অনেকেরই সলিল সমাধি হয়েছে। তাই ঐ এলাকাটি সব সময়ই মুক্ত ছিলো। বলা যায় মুক্তি বাহিনীর জন্যে সে এলাকাটি ছিলো নিরাপদে চলাচলের একটি বিশেষ এলাকা।
একদিন একটি ছালার ব্যাগে চার / পাঁচটি গ্রেনেড দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছিলো অন্য ক্যাম্পে পৌঁছে দিতে। আমি দু'কেজি চাউল (পেট মোটা টেঁপি চাউল তখন ছিলো প্রতি সের বার আনা)। এর সাথে দুই হালি হাসের ডিম নিয়ে সব কিছুর নিচে রাখি গ্রেনেড। রেললাইন ধরেই যেতে হবে বিকল্প কোন রাস্তা নেই। অথচ আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে পৌঁছার পুর্বেই একটি রেললাইনের পুল বা ব্রিজ রয়েছে। আর তখনকার রেললাইনের পুল বা ব্রিজ মানেই পাকসেনা আর রাজাকারের ক্যাম্প।

এক অসমসাহসী যুবকের মতো বুক টান করে হাটতে থাকলাম। পুলের কাছে পৌঁছলে একজন রাজাকার চিৎকার করে *হোল্ড* বলে আমাকে থামালো। এবং আমার ব্যাগ চেক্ করতে চাইলো। পাকসেনারা তখন আমাদের দেশীয় মদের বোতল টানছিলো বলেই মনে হলো। তারা ইশারা দিলো তাকে। মনে হলো যেন বলছে.. গুলি করে ফেলে দাও...মুক্তি হোগা..ও.....। সে ইচ্ছে করলে তা করতেও পারতো। রাজাকারটি আমার পরিচিত ছিলো। এবং আমাদের ইনফরমারের কাজও করতো।

রাজাকারটি বুঝতে পেরেছে এবং নিশ্চিত হয়েছে যে আমার ব্যাগে কী আছে।..তবুও সে পাকসেনাদের বললো..ওস্তাদ ব্যাগমে কুছ বি নেহি হ্যায়..যো হ্যায় ও খানেকা চাল আওর আন্ডা হ্যায়। সে ব্যাগ থেকে একটি ডিম উঠায়ে দেখালো পাকসেনাদের। তারপর আমাকে বললো- তাড়াতাড়ি ভাগো, কাইট্টা পড়ো। এ রাস্তায় আর কখনো আইবা না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই রাজাকার কাউসার নিজ এলাকাতেই আজও বেঁচে আছে এবং সৎভাবেই জীবনযাপন করছে।

স্মৃতির উপর চাপ প্রয়োগ করে করে এ মাঝ বয়সে এসে আজ যখন একাত্তরের স্মৃতির জাবর কাটছি তখন সেই দিপালী এবং জোবেদার করুণ মুখখানি আমার সামনে বার বার ভেসে উঠছে। জোবেদা সবেমাত্র দশম শ্রেণীর ছাত্রী। স্থানীয় একটি হাই স্কুলে অধ্যয়নরত। তার পিতা মোড়ল গোছের মানুষ। গাঁও-গেরামে বিচার আচার করে। মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত পরিবার বলে এলাকার লোকজনও বেশ সমীহ করে। কিন্তু পাকবাহিনীরা এলাকায় এলে সে যোগ দিল শান্তি কমিটিতে। সে এলাকার শান্তি চায়, দেশের শান্তি চায়, জনগনেরও শান্তি চায়। বিপত্নীক এ জমির আলী সময়ে অসময়ে দু'একদিনের জন্যে কোথায় কোথায় হারিয়ে যেত তা কেউ জানে না। সে এক রহস্যজনক ব্যাপার।

পাকসেনাদের নিয়মিত মেয়ে-মহিলা সাপ্লাইয়ার এক রাজাকার জোবেদাকে স্কুল থেকে যেতে দেখে তার পিছু নেয়। সে জানতে চায় মেয়েটি কোন বাড়ির। শেষে পাকসেনাদের জানায়। জমির আলি বাড়ি নেই। সেই রাজাকার দু'জন পাকসেনা নিয়ে সেই শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান জমির আলির বাড়িতে গিয়ে হানা দেয়। তবে তারা জানতো কিনা জানি না এটাই তাদের পদলেহী চাটুকার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের বাড়ি। তারা জোবেদাকে ধরে নিয়ে যায় ক্যাম্পে। দিনভর তারা জোবেদার উপর যৌন অত্যাচার চালায়।

বিকেলের দিকে তারা জানতে পারে এ মেয়েটি তাদেরই পদলেহি চাটুকার জমির আলির মেয়ে। তখন তারা তাকে প্রায় মুমূর্ষ অবস্থায় বাড়ি পৌছে দেয়। জমির আলি রাতে বাড়ি এলে জানতে পারে ঘটনা। সে দৌড়ে যায় সেই পাক বাহিনীর ক্যাম্পে। পাকসেনা আর রাজাকাররা তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে। পাকসেনারা পাকিস্তানী মওদুদী টাইপে জমির আলিকে বয়ান করে শোনায়...

জঙ্গা কি ময়দান মে এ সব কুছ জায়েজ হ্যায়। সবকুছ হালাল হ্যায়। তোমারা লাড়কীকো ছমজাও। আওর যেত্না পাইসা চাইয়ে লেকে যাও, ওছকো এলাজ করাও। মগার এক বাত হ্যায় ইয়ার তোমতো কভি তোমারা ঘরপে হাম লোগকো দাওয়াত দিয়াই নেহি। হাম লোগোকো ক্যায়ছে পাত্তা চলেগা ও তোমারা লাড়কী হ্যায়। যো ভি হুয়া ওছকো ভুল যাও। ওছকো এলাজ দেকার আচ্চা কর। ফের কভি কভি ওছকো ভেজ দাও হামারা পাছ দু’ এক ঘন্টাকি লিয়ে। তোমকো মালামাল কর দিউঙ্গা। এরিয়াকা রইস বানা দেউঙ্গা...। তোম্ ছোচ বি নেহি চাকোগে হাম লোগ তোমারি লিয়ে কিয়া কিয়া কর ছাকতাহে....।।

জমির আলি একটি টাকার বান্ডেল হাতে নিয়ে বাড়ি চলে আসে। মেয়ের জন্যে ডাক্তার আনে। তার চিকিৎসা করায়। দিনে দিনে তাকে সুস্থ করে তোলে। কিন্তু পাকিস্তানী সেনাদের শিখিয়ে দেয়া সেই মহৎ (!?) বাণীগুলো সে সবই মেয়ের কাছে বয়ান করেছে। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তেই মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু জোবেদা কোন কথা বলে না । সারাদিন শুধু একাকী বসে থাকে আর কি যেন ভাবে। চোখের পানি ফেলে। জোবেদার সদা হাস্যোজ্জল মুখে যেন আষাঢ়ের কৃষ্ণ কালো মেঘ স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে।

একদিন মুক্তিবাহিনীর জন্য গোয়েন্দাগিরি করতে বেরিয়েছি। ফসলি জমির আঁকা-বাঁকা আল ধরে হাটছিলাম। পাশের একটি আখ ক্ষেত থেকে একটি আখ নিয়ে চিবুতে চিবুতে পথ চলতে থাকি। চলতে চলতে জোবেদাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভরা ভাদরের মতো তারুণ্যে পূর্ণ এক ছটপটে প্রজাপতি মেয়ে। অথচ বিমর্ষ বদনের মেয়েটিকে এমনি অবস্থায় বাড়ির বাটে বসে থাকতে বহুবার দেখেছি। সেদিনও দেখছিলাম। সেও আমার দিকে বার বার কেমন যেন করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো। সেদিন ভরসন্ধ্যে সে পথে দিয়েই যখন যাচ্ছিলাম। মেয়েটি আমাকে ডাক দিয়ে বসলো। এই যে ভাই, তুমি কি আমার একটু কথা শোনবে...।?

আমি জানি এটা শান্তি কমিটির চেয়াম্যানের বাড়ি। এ মেয়ে নিশ্চয়ই তারই হবে। দেখতে বেশ মিষ্টি মেয়ে। সুন্দর গড়ন। অথচ তার চোখেমুখে বিষাদের ছায়া। এ বয়সের মেয়েরা হবে চঞ্চল এবং সব সময় থাকবে হাসিখুশি। অথচ এ মেয়ে যেন ভাবলেশহীন...। আমি তাকে দেখে সব সময়ই এসব ভাবতাম। মনে হয়েছে তার জীবনের উপর দিয়ে কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। যা আমি একটু চেষ্টা করলে বা অগ্রসর হলে জানতে পারবো। আমার মতো সে বয়সে তেমন আগ্রহ, বাঁধ-ভাঙ্গা নদীর মতো আবেগ সবার মাঝেই প্রবাহিত হয়। যা আমার মাঝেও ছিলো।

সেদিন সে মেয়েটির ডাকে সাড়া দিয়ে আমি সানন্দে এগিয়ে গেলাম। একটি মেয়ে ডেকেছে বিধায় সেদিন নিজে মনে মনে যেমন আনন্দিত তেমনি গর্ববোধ করছিলাম। কেননা নিজের বোন ছাড়া ওভাবে কেহ কোন দিন ডাকেনি কিনা তাই। মনের মুকুরগুলো লজ্জাবতীলতার মতো যেন নুয়ে আসছিলো। আমার সেই লজ্জাবনত: মুহূর্তে সে বললো- তুমি কি জানো মুক্তি বাহিনীর ক্যাম্প কোথায় আছে। যদি জানো আমাকে নিয়ে যাও। আমি মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেবো। দেশের জন্যে যুদ্ধ করবো। যুদ্ধ করে মরবো। ঐ বাজারের ক্যাম্পটিতে যতগুলো নাপাক কুত্তা আছে তাদের মারবো। এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলতে গিয়ে মেয়েটি হাফাতে থাকে। অবশেষে সে কেঁদে ফেললো। চোখে তার শ্রাবণের বর্ষণ।

মেয়েটির সে কথা শোনে আমার মনে হলো এ মেয়ে নিশ্চয়ই কোন বাহানা করছে না। কিংবা কোন ফন্দিও আঁটছেনা যে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প খুঁজে পেলে সে খবর পাইক্যাদের কাছে পৌঁছে দেবে। অনেক্ষণ ভাবার পর অবশেষে তাকে নিয়ে গেলাম আমাদের ক্যাম্পে। আমাদের কমান্ডারতো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো সেই জোবেদা নামের মেয়েটিকে আমার সঙ্গে দেখে। কমান্ডার বলছে- এ মেয়ে একজন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান এর মেয়ে। নিশ্চয়ই কোন ফন্দি নিয়ে এখানে এসেছে।

পরিবেশটি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে দেখে আমি প্রাণপনে অনেক বুঝানোর পর এবং জোবেদাও তার দুর্বিসহ কাহিনী বর্ণনা করলে তাতে সবারই দয়া হয়। কমান্ডার একটি টেন্ডুপাতার বিড়ি টানতে টানতে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন- ঠিক আছে তাহলে এখন থেকেই কাজে লেগে যাও। ভালোভাবে শিখে নাও শত্রুদের কীভাবে ঘায়েল করতে হবে। সে থেকেই জোবেদা আমাদের সঙ্গে কাজ করছে। জোবেদা হয়ে গেলো আমার সহযোদ্ধা, সহকর্মী এবং দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা শোনার সাথী। তবে সে থাকতো অধিকাংশ সময়ই বিমর্ষ। তার চেহারায় ফুটে উঠতো সময়ে সময়ে চরম প্রতিশোধের নেশা!

পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা সেই ক্যাম্পটি আক্রমনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। জোবেদা কাউকে না বলেই সে তার

বাপকে একদিন হত্যা করে বসলো। তাতে তার প্রতি আমাদের বিশ্বাস বেশ পাকাপোক্ত হলো বটে; তবে ওই ঘটনার পর সে এলাকা আমাদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়লো। তাইতো দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া হলো পাক-রাজাকার ক্যাম্পটি আক্রমন করার পরপরই আমরা সে স্থান ত্যাগ করবো। পরিকল্পনা অনুসারে আমরা জোবেদাকে ক্যাম্পে আগে পাঠালাম। তাকে বলেছিলাম- ঠিক একঘন্টা পর আমরা কূকিল ডাকের আওয়াজ দেবো। আওয়াজ পেলেই তুমি জরুরী বাথরুমের কথা বলে ক্যাম্প থেকে সরে আসবে।

কিন্তু না। সে তা করেনি। জোবেদা সেই ক্যাম্পে পৌঁছেই রাজাকারদের সাথে কী সব কথা বলেছে। রাজাকাররা তাকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। কেননা তার বাপকে দু'দিন আগেই কে বা কারা মেরেছে। সেই জাতীয় কোন খবর নিয়ে কিংবা কোন সাহায্যের জন্যেও সে এ ক্যাম্পে যায়নি। এমন অসময়ে জোবেদার সেই ক্যাম্পে যাওয়া মানে অন্য কোন মতলব আছে এমন সন্দেহের কারণে রাজাকারেরা জোবেদাকে ভিতরে ঢুকতে অনুমতি দেয়নি। তবুও সেই জেদী মেয়ে জোবেদা জোর করে ক্যাম্পে ঢুকেই দেখতে পায় দু'টি পাকসেনা একজন মহিলাকে জবরদস্তি ধর্ষন করছে। তার মাথায় আগুন চেপে যায়। ঠিক তক্ষুণি তাকে দেয়া পিস্তল থেকে গুলি করে দু'জন পাক সেনা মেরে ফেললো। আর অমনি রাজাকাররা তাকে গুলি করে ফেলে দেয়।

দিপালীরা আজো বেঁচে আছে এবং আজো ধর্ষিত হচ্ছে। যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা যুদ্ধ করে দেশটি স্বাধীন করেছিলাম। সে স্বপ্নকি শুধু স্বপ্ন হয়েই থেকে যাবে? আমাদের স্বপ্নগুলো কি প্রতিনিয়ত দিপালীদের মতো, জোবেদাদের মতো এভাবেই ধর্ষিত হতে থাকবে ???

আমরা অপ্রস্তুত অবস্থায় গুলির আওয়াজ পেয়ে গোলাগুলি শুরু করে আধাঘন্টার মধ্যেই বুঝতে পারলাম জোবেদা হয়তো আর নেই। ক্যাম্পেরও সব খতম। আমরা চারদিক থেকে আক্রমন করেছিলাম। অতএব তাদের পালিয়ে যাবার কোন রাস্তাই ছিলো না। পরে আমরা বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ জোবেদাকে উদ্ধার করি গুলীবিদ্ধ মুমুর্ষ অবস্থায়। ক্ষীণ কন্ঠে সে ঘটনা বর্ণনা করে। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই সে মারা যায়। সম্মানের সহিত তাকে তার বাড়ির আঙ্গিনাতেই দাপনের ব্যবস্থা করি। প্রায় দু'যুগের মতো দুর প্রবাসে থেকেও সেই শহীদ জোবেদাকে স্মরণের মাঝপথে কখনও ঘাস বিচালীর জন্ম হতে দেইনি। কেন জানি তার স্মৃতি আমাকে বার বারই বেশী বেশী ভারাক্রান্ত করে।

আজ এতো বছর পরে সেই জোবেদাকে স্মরণ করে চোখে জল আসে। হায়! জোবেদা তোমার ইতিহাস কেউ জানে না। কেউ লেখে না। ভালোই হয়েছে। ডাস্টবিনের দুর্গন্ধযুক্ত বর্তমানের ইতিহাস থেকে তুমি মুক্ত আছো। তোমার মতো হাজারো জোবেদাদের কথা কেউ বলবে না। কেউ জানবে না। কেউ লেখবে না। তাতে কী। তোমরাই প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা, প্রকৃত দেশপ্রেমী। এদেশের মাটি ও মানুষেরাই তোমাদের চিরদিন স্মরণ করবে। তোমাদের স্মৃতির আতর-গোলাপ সুগন্ধই আমাদেরকে আমাদের অতীত ঐতিহ্য, প্রকৃত ইতিহাস মনে করিয়ে দেবে। আর ঘৃণা করতে প্রেরণা যোগাবে আজকাল যারা তোমাদের সেই মহান ত্যাগকে অস্বীকার করছে। জোবেদা তোমার সেই ধর্ষকরাই আজ নতুনভাবে ইতিহাসকে ধর্ষণ করে করে তার বিকৃতি ঘটাচ্ছে। তোমাদের অবদানকে খাটো করছে। তোমাদের সকল স্মৃতি মুছে ফেলার পায়তারা করছে। এতো লজ্জা আর কষ্টগুলো রাখি কই?

একাত্তরের আর একটি ঘটনা যা আমাকে আজো অপরাধী বানায়, কাঁদায়। সে ঘটনার সেই অসহনীয় দৃশ্য মনে হলেই যন্ত্রণায় শরবিদ্ধ পাখির মতো ছটপট করতে থাকি। একদিন বিকেলে গিয়েছি চুপিচুপি মাকে দেখতে। খুব সখ হলো ডাকাতিয়া নদীতে একটু ডুবিয়ে গোসল করবো। নদীতে তখন পানি পাড় থেকে দু'তিন হাত নিচে। নদী ভরা কচুরীপানা। একটি গামছা নিয়ে গেলাম নদীতে। পরম তৃপ্তিতে ডুবিয়ে গোসল করছি কচুরিপানা সরিয়ে সরিয়ে। এমন একটি সুযোগ এসেছে অনেকদিন পর। শেষ ডুবটি দিয়ে যখন মাথা উপরে উঠাতে যাই, ঠিক তখনি মাথায় একটি যুবতির লাশ ঠেকে। আমি ভড়কে যাই। মনে হলো ষোল আঠারো বছর বয়সের মেয়েটি। তরতাজা লাশ। আমার মনে হয়েছে মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেই ঘটনাটি ঘটিয়েছে পাক বাহিনী কিংবা রাজাকাররা। তাদের সন্দেহ করার সঙ্গত কারণও ছিলো। তখনকার ওই সকল জঘন্য এবং গর্হিত কাজগুলো একমাত্র তারাই করতো। লাশটি একটু ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করি। হয়তো আমাদের কোন আত্মীয়ও হতে পারে সে ভেবে। মেয়েটির গালে-ঠোটে-বুকে মানুষরূপী কুকুরের কামড়ের দাগ আমাকে বলে দেয় মেয়েটির উপর দানবেরা কী তীব্র যৌন অত্যাচার চালিয়ে চালিয়ে মেরেছে।

হায়! '৭১ এর সেই দিনগুলোতে আমাদের মা-বোনদের এমনি ইজ্জতের বলির সাথে সাথে

জানটারও বলি হয়েছে শত-সহস্র জনের। দু'লাখ মা-বোনের ইজ্জত এভাবেই নিলাম হয়েছে যাতে প্রধানতম দায়ী আমাদের দেশের পাকিস্তানি প্রভুভক্ত সেই সারমেয়কুল রাজাকার বাহিনী। তরতাজা সেই যুবতী মেয়ের লাশটির অবস্থা দেখে তখন আমার মনে হলো কে যেন লোহার সাড়াশী দিয়ে আমার কলিজাটা চেপে ধরেছে। শ্বাস টানতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিলো....।।

এরই মাঝে কীভাবে যেন আমার গ্রামে আসার খবরটি পাক সেনারা পেয়ে গেছে। রাজাকার, আল বদর, আল শামস দ্বারা খবরটি তাদের কাছে পৌঁছে থাকবে হয়তো। আমার এ ধারণা অমূলক নয়। কেন না তখনকার দিনে একমাত্র ঐ সব পাকি- প্রভুভক্ত কুকুরগুলো ছাড়া এ কাজ অন্য কেউই করতো না। অবশ্য তখন ঐ শ্রেণীর অভাবও ছিলো না। অবশেষে দেখা গেলো দু'জন রাজাকার এবং দু'তিন জন পাকসেনা হন্যে হয়ে আমাদের গ্রামে ঢুকে পড়েছে।

তখনকার গাঁও গেরামের একটা প্রচলিত নিয়ম-রীতি ছিলো... যদি কেহ জানতো রাজাকার কিংবা পাক সেনা কোন গ্রামের দিকে আসছে। তাহলে একজন আরেক জনকে চীৎকারে জানান দিতো এভাবে......আইয়ে রে ...ভাই ...আইয়ে..... এ ভাষাটি আমাদের চাঁদপুরের সর্বত্র শোনেছি। আমাদের এলাকার লোকেরা ঠিক একই ভাষা ব্যবহার করে আসছে সেই সুদীর্ঘকাল ধরে যা উচ্চারিত হতো শুধু বর্ষা মৌসুমে। আষাঢ়-শ্রাবণের বৃষ্টি বলা নেই কওয়া নেই যখন তখনই ঝর ঝর বৃষ্টি ঝরতে শুরু করে। তাতে উঠোনে শুকাতে মেলে দেয়া ধান ও অন্যান্য ভেজার ভয়। তাই বৃষ্টির লক্ষণ কেহ টের পেলেই.....গাঁয়ের বউ-ঝিদের এবং অন্য সকলকে সাবধান করতো ঠিক এভাবেই চীৎকার করে... আইয়ে রে ভাই... আই য়ে ...।

আর একাত্তরে এ চীৎকার শোনার সাথে সাথে মানুষ বুঝতো (রাজাকার আর পাক-সেনাদের আগমন বার্তা) যে যেদিকে পারে পালায়। ঝোপে-জঙ্গালে, পাটক্ষেতে, ডোবা-নালায়। তখন কারো কোন হুশ-জ্ঞান থাকতো না। মনে হতো যেন রোজ কেয়ামত বা শেষ বিচারের দিন । কেউ কারো জন্যে নয়। নিজকে নিয়ে ব্যস্ত। নিজকে বাঁচাও প্রথম। নিজে বাঁচলে বাপের নাম। একাত্তরের সেই উন্মাতাল দিনগুলোতে ইহাই ছিলো চরম বাস্তবতা। সেদিন আমিও পালিয়েছিলাম।

সেদিন তারা এসেই পাশের হিন্দু বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তাদের আগমন টের পেয়ে সবাই পালিয়েছে। পালাতে পারে না শুধু ৬ মাসের বাচ্চাটি নিয়ে সুন্দরী দিপালী। খড়ের মোচার পেছনে লুকিয়েছিলো সে। নিজ বাচ্চাকে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে রেখেও শেষ রক্ষা পায়নি সে। আমাদের স্বদেশী ভাইদের একজন সেই খানা-খন্দ থেকে দিপালীকে আবিস্কার করে। চুল ধরে টেনে-হেচঁড়ে উন্মুক্ত উঠানে তাকে বের করে আনে। আমাদের স্বদেশী তিনজন আর দু'জন পাকসেনা মিলে তাকে মানে দিপালীকে নিরাবরণ করে।

ওরা দিপালীর কোলের বাচ্চাটি ছুড়ে ফেলে দেয় খড়ের মোচার পাশে। বাচ্চাটি গগন বিদারী চিৎকার করে চুপ হয়ে যায়। সেদিনের সেই ৬ মাসের বাচ্চাটির চিৎকারে মনে হয়েছে আলার সপ্ত আকাশ কেঁপে কেঁপে উঠেছিলো। বরাবরের মতো আমাদের এই অসহায় বাঙালিদের অবস্হা নিয়ে সেদিন স্রষ্টাও হয়তো নিরবে হেসেছিলো। তারপরের দৃশ্য বর্ণনার যোগ্য নয়। তারপর একে একে ছিঁড়ে-ছুড়ে খেলো দিপালীকে সেই নেকড়েগুলো।

গগনবিদারী চিৎকারে সেদিন বাচ্চাটি নীল হয়ে গিয়েছিলো। সে ঘটনার পরও সে বাচ্চাটি বেঁচে গিয়েছিলো বটে, তবে তার হাতে-পায়ে যে আঘাত পেয়েছিলো যা স্বাধীনতার প্রামান্য দলিল হিসেবে আজো প্রকাশমান। আজো সেদিনের সেই সাক্ষী বহন করে চলছে তার সে দু'টি অঞ্জা। যাকে বলা চলে স্বাধীনতার চিহ্ন!

সেই অসহায় সুন্দরী দিপালী আজো বেঁচে আছে সেদিনের রাজ সাক্ষী হয়ে। স্বাধীনতার জন্যে নিজকে উৎসর্গীকৃত এক বঞ্চিত বীরাঙ্গানা। তার এক বড়দি' পুতুলও সে সময়কার বীর বীরাঙ্গনা। কিন্তু সময়ের সুচিন্তিত ব্যবহার সে আপাকে উন্নতির হিমালয়ের চূড়ে নিয়ে যায়। গায়ে-গতরে বেশ নাদুস-নুদুস। সে আপাও দিপালীদের কোন খোঁজ খবর রাখে না। শুধু দিপালীরা কংকালসার শরীরটি নিয়ে আজো বেঁচে আছে স্বাধীনতার পবিত্র দলিল হয়ে।

সেদিন যদি আমি এলাকায় না যেতাম, তাহলে হয়তো সেই পাকসেনারা ওভাবে আসতো না এবং দিপালীও ধর্ষিত হতো না। সেদিন থেকে সেই অপরাধবোধ আমাকে আজও নীল যন্ত্রনায় আক্রান্ত করে। সেই দিপালীরা আজো ধর্ষিত হচ্ছে এবং বেঁচে আছে বুকের ক'খান হাড় নিয়ে। দিপালীকে নিয়ে আমি একটি বিশাল কবিতা লিখেছিলাম। যার শিরোনাম ছিলো *'একাত্তরের গল্প''* পাঠকদের কবিতাটি পুনরায় পড়াতে চাই এমন লোভটুকু সামলাতে পারলাম না বলেই স্বার্থপরের মতো কবিতাটি হুবহু এখানে পুনঃপ্রকাশ করে দিলাম। যা আমার *'তুমি এলে তাই বৃষ্টি এলো'* নামক কাব্যগ্রন্থেও সংকলিত করেছি।

একাত্তরের গল্প

আইয়েরে..... ভাই.... আইয়ে....
একাত্তরের সেই মহান

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন উপরোক্ত
শব্দত্রয় ছিলো তখনকার গ্রামবাংলার
জনগনের জন্যে বিশেষ করে
আমার হোম ডিস্ট্রিক চাঁদপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের
লোকজনের জন্যে এক বিশেষ সতর্ক সংকেত!!
একাত্তরের সেই বিষ-জ্বালাপূর্ণ দিনগুলোতে
ঐ ডাক বা সংকেত যদি কেউ শুনতো
প্রথমেই তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠতো
ফিলে উল্টে যেতো!
পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝিম ঝিম করতো!
মানুষ কিংকর্তব্যবিমুঢ় হতো।
পেছনে সমস্ত দামী ও প্রিয়বস্তুকে ফেলে
আলাহ্‌র দেয়া শুধুমাত্র জানটি নিয়ে পালাতো
যে যেদিকে পারে দে-ছুট্!
ঝোপ-জাঙ্গাল, পানিতে,পচা ডোবায়
ধান কিংবা পাট ক্ষেতে আত্মগোপন করতো!
তার কারণ
বর্বর পাকসেনাদের আচরণ এতোই গর্হিত ছিলো যে
ওদের গালি দেবার ভাষাও আমার জানা নেই
ওদের ঘৃণা করতেও আমার ঘৃণা হয়!
আমার দৃষ্টিতে তারা যে পাপিষ্ঠের কাজ করেছে
তাতে ওরা ঘৃণারও উপযুক্ত নয়।

ভরা ভাদর। মানে চারদিকের বিল-ঝিল, নদী-নালা
সর্বত্রই পানি থৈ থৈ করছে
মাঝে মাঝে আপন সন্তানের খোঁজে
দু'একটা ডাহুক-কোড়ার ডাকও ভেসে আসছিলো।
সারা দিনের খরতাপ বিলিয়ে নেতিয়ে পড়েছে
পশ্চিম দিগন্তে ক্লান্ত সূর্য
সময় হবে হয়তো বিকেল পাঁচটা
যেখানে এ গল্পের শুরু
এ গল্পের নায়িকার ললাটে
সিঁদুরের বদলে কলংকের তিলক !?

(২)

একাত্তরের বিধ্বস্ত বাংলার গাঁয়ে-গঞ্জে, শহরে-নগরে
পথে-প্রান্তরে, অলিতে গলিতে
তখন ঘটতো যা নিত্য
আমাদের পেছনের প্রতিবেশী হিন্দু বাড়িতেও
ঘটে গেলো তা অবলীলায়
দিনের প্রদীপ্ত সূর্যের আলোতে।

অনিন্দ সুন্দরী গৃহবধূ দিপালী
সেদিনের সেই সতর্ক সংকেত শোনেও
পাট পচা দুর্গন্ধযুক্ত ডোবায় কিংবা জঙ্গালে
ঝাপিয়ে পড়তে পারেনি।
পারেনি নিরাপদ দুরত্বে পালাতে
যেমন পালিয়েছিলো অন্যরা।

কেননা তার কোলে ছিলো ছ'মাসের বাচ্চা।

তিনজন রাজাকার সহ দু'জন পাক-সেনা
হন্ত দন্ত করে হাতের অস্ত্রটি তাক করে ঢুকে পড়লো
একেবারে বাড়িটির উঠোন পর্যন্ত।

ভাবে-সাবে বোঝা যাচ্ছে যেন মস্তবড়ো শিকারী
তাদের সামনেই যেন একদল চিত্রল হরিণ
কিংবা বাংলার বিচ্ছুর দল মুক্তিসেনা
সামনে তিনজন রাজাকার এবং
পেছনে ধীর পদক্ষেপে মোছে তা দিতে দিতে
এগিয়ে আসছে দু'জন পাক-সেনা।
সবারই লালসা ভেজা চোখ, সন্ধানী দৃষ্টি
এখানে ওখানে খানা-খন্দে...।

এমনি বিপদ সংকুল সময়েও দিপালী তার
পরম আদরের সন্তানকে বাউজের বোতাম খুলে
দুধ দিয়ে শান্ত রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছে
বাড়ির একটি খড়ের মোচার পেছনে
নিজকে কিছুটা আড়াল করে।

দুরু দুরু করছে তার বুক,
কোলের বাচ্চাটির এমনি জড়ো-সড়ো ভাব অসহ্য
লাগছিলো
তাই সে বার বারই কেঁদে ওঠার চেষ্টা করলে
দিপালী তার শাড়ির আঁচলে
বাচ্চার মুখ চেপে ধরেছে নিদারুণ নিষ্ঠুর ভাবে!

(৩)

না তবুও পেলো না দিপালী তার শেষ রক্ষা।
আমাদেরই স্বজাতি দু'জন রাজাকার দেখে ফেলে
তাকে
হাত ধরে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে আসে তাদের
সেই মহাজনদের কাছে
যারা মহাজন সেজে বসেছিলো
আমাদের এই দেশটির ঘাড়ে বিগত চব্বিশ বছর।

দিপালী কিংকর্তব্যবিমুঢ়! কোন শব্দ নেই তার কণ্ঠে
যেন হঠাৎ আকাশ ভাঙ্গা এক বজ্রপাতে
সে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।
ওরা তার ছ'মাসের কোলের বাচ্চাটিকে ছুড়ে মারলো
সেই খড়ের মোচার উপর।
বাচ্চাটি খড়ের মোচাতে লুটো-পুটি খেয়ে
শেষ রক্ষা পেলো বটে!
কিন্তু সেদিন তার হৃদয় বিদারক কান্নার চিৎকার
শ্রষ্টার সপ্ত আকাশ কেঁপে কেঁপে উঠছিলো!!

সে দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করে দিপালী
নির্বাক কালী মূর্তি ধারণ করে মূক হয়ে গেলো।
কিংবা বলা যায় যেন মৃত্তিকায় তৈরী
স্বরস্বতি, মাটির পুতুল।
দুর্গা হলে হয়তো একাধিক হাতে

বিভিন্ন হাতিয়ারে আঘাত করতে পারতো
সেই নারী খেকো নেকড়েগুলোকে।
নিতে পারতো চরম প্রতিশোধ।
কিন্তু মানবী সে দিপালী দানবী নয়
তাই সে ছিলো ভীষন দুর্বল-অসহায়, নিরস্ত্র
সে সময়ের অন্য সকল মানুষের মতোই।

ওরা উগ্র উল্লাসে দিপালীকে একে একে
করে ফেললো নিরাবরণ!
তৃষিত নেকড়ের মতোই ঝাপিয়ে পড়লো
দু'দুটো আস্ত হিংস্র পাক-হায়েনা
ওরা লুটে-পুটে গেলে পরে
আমাদের স্বজাতি তিনটি আস্ত রাজাকার
নাকি আলবদর, আলসাম্‌শ
অজ্ঞান সেই দিপালীকে করলো ভোগ
ওদের চৌদ্দ পুরুষের নাম ডুবায়ে!!

(৪)

হায় ! স্বাধীনতা।
যাঁদের সেই মহান ত্যাগের বিনিময়ে
জন্ম হয়েছে তোমার।
অথচ তুমি কী দিলে সেই বীরাঙ্গনাদের!?
না ওরা পায়নি কিছু!
পায়নি নিদেন পক্ষে একটু সম্মানও!
কেউ বলেনি সেই দিপালীদের কথা
কেউ লেখেনি তাঁদের ত্যাগের কথা
সেই অন্তর্জ্বালার কথা।
অথচ তোমার বড় বড় বীর গাঁথায়
ভরে আছে যতো অলীক উচ্চারণে,
মিথ্যের ধুলি-বালি আর আবর্জনায়।

আমার প্রিয় স্বাধীনতা - হে জননী আমার
চেয়ে দেখো তোমারই বুকে আজ
বহাল-তবিয়তে বড় বড় আসনগুলো দখল করে
সাচি পান খেয়ে এদিক ওদিক পানের পিক ফেলছে
আর পা দু'খানা দোলাচ্ছে সীমাহীন আয়েশে
একাত্তরের সেই পাক-সেনাদের দোসর
এবং চাটুকারগুলো।

যারা সেদিন স্বাধীনতা চায়নি
তারাই আজ এই স্বাধীন দেশটির
পবিত্র জাতীয় পতাকা
নিজেদের গাড়িতে বহন করছে।
হায় এ লজ্জা লুকাবার যে একটুকরো
জায়গাও নেই এই বাংলায়।

হায় স্বাধীনতা!
একটু নজর ঘুরিয়ে দেখো
বুকের ক'খান হাড় নিয়ে
আজও বেঁচে আছে দিপালীরা
দীর্ঘশ্বাসের দেয়ালী জ্বেলে।
****

দিপালীরা আজো বেঁচে আছে এবং আজো ধর্ষিত হচ্ছে। যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা যুদ্ধ করে দেশটি স্বাধীন করেছিলাম। সে স্বপ্নকি শুধু স্বপ্ন হয়েই থেকে যাবে? আমাদের স্বপ্নগুলো কি প্রতিনিয়ত দিপালীদের মতো, জোবেদাদের মতো এভাবেই ধর্ষিত হতে থাকবে ???

লেখকের কৃতজ্ঞতা ঃ একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমুলক আমার একটি লেখা 'আমার দেখা একাত্তর' সংক্ষিপ্তাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের বাংলা ওয়েবসাইট 'ভিন্নমত' এ। এর পরপরই লেখাটি কানাডার বাংলা ওয়েবসাইট "সদালাপ", জনপ্রিয় ই-মেলা, এবং জাতীয় দৈনিক আজকের কাগজ এ প্রকাশিত হলে পাঠকদের কাছ হতে শত শত ই-মেইল এর মাধ্যমে আশাতীত সাড়া পাওয়া যায়। রিয়াদের বাঙালি কমিউনিটিতে উক্ত লেখাটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তবে অনেক বন্ধুরা অবন্ধুতে পরিণত হয়!

যাদের অবন্ধু সুলভ আচরণ আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে! ২০০৯ এর জানুয়ারীতে যখন ওরা কয়েকটি দৈনিকে জানতে পারলো আমি একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির সউদী আরব শাখার সভাপতি ঠিক তখনই মারমুখী হয়ে উঠেছিলো মৌলবাদী চক্র। আর তাতে আমি দারুণ অনুপ্রাণিত ও সাহসী হয়ে উঠি। সংক্ষিপ্ত লেখাটিকে আরো সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল করার জন্যে মনোযোগী হই। তাতে কিছু পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের সাহায্য নিই। এ জন্য ওই সকল পত্র-পত্রিকার সম্মানিত সম্পাদক, কলামিষ্ট এবং গ্রন্থকারদের নিকট আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

পত্র-পত্রিকা / গ্রন্থ ঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক আজকের কাগজ, সাপ্তাহিক২০০০ এবং লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামান্য দলিল গ্রন্থ) আমি বিজয় দেখেছি।
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ মেজর জেনারেল (অবঃ) সুবিদ আলী ভুইঁয়া, শাহরিয়ার কবির, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বেবী মওদুদ, হরিপদ দত্ত, কে. জি. মুস্তফা, কবি শামসুর রাহমান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, মেজর রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম এবং এম. আর. আখতার মুকুল (সদ্য প্রয়াত)

লেখকঃ
প্রায় দু'যুগ ধরে রিয়াদ প্রবাসী এ লেখক একজন ছড়াকার, সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক এবং একজন প্রকাশক। লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ঃ ১৪টি
সম্পাদিত যৌথকাব্যগ্রন্থঃ ১ (দেয়াল বিহীন কারাগার এর প্রেম)
একাত্তর -বাঙালি জাতির জন্য মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ। (সম্পাদিত)

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
মরুপলাশ, রূপসী চাঁদপুর

তারিখঃ প্রথম প্রকাশঃ
৩রা পৌষ, ১৪১১বাঙলা
১৭ডিসেম্বর ২০০৪ইং

দ্বিতীয় প্রকাশঃ
১৪ডিসেম্বর২০০৫ইং
অগ্রাহায়ন-১৪১২বাঙলা।

তৃতীয় প্রকাশঃ
বাঙালির স্বাধীনতার মাস
৬ মার্চ ২০১১ইং